পরলোকের সন্ধান।



শ্রীমদাচার্য্য ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের

উপদেশাবলী হইতে সংগৃহীত।

১৩৩৫ সাল।

কলিকাতা
৩নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট,
"নববিধান প্রেসে"
বি, এন্, মুখার্জ্জি কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

নালু দাদা,

"প্রকৃতি"কে হারিয়ে প্রাণের জ্বালায় পিতৃদেবের বইগুলির আশ্রয় নিয়ে এই পুস্তকগুলি জড় করেছি। এই বইখানি তোমায় দিচ্ছি। তুমি কত লোকের শোকের সময় সান্ত্বনা দাও। এই বইখানি পড়ে, "পরলোকের সন্ধান" পেয়ে আমার মত কত প্রাণ শান্তি পাবে।

তোমার স্নেহের—

ধনী।

পরলোকের সন্ধান।



আচার্য্যের উপদেশ—প্রথম খণ্ড।

বিশ্বজনীন জীবন্ত ধর্ম্ম—

আশ্চর্য্য তাঁহার করুণা! যখনই শোকে কাতর হইয়া তাঁহার নিকট ক্রন্দন করিয়াছি, তিনি আমার অশ্রুজল মোচন করিয়া, সান্ত্বনা দ্বারা তাপিত হৃদয়কে শীতল করিয়াছেন।—(পৃঃ ৩)

সংসারের অন্ধকার মধ্যে তুমি আমাদের আলোক; ভয় ও দুর্ব্বলতার মধ্যে তুমি আমাদের বল; অনিত্য সম্পদের মধ্যে তুমি আমাদের চিরসম্পদ।—(পৃঃ ৮)

*　　*　　*　　*　　*

সত্যের সৌন্দর্য্য—

মনুষ্যাত্মার সহিত ব্রাহ্মধর্ম্ম সর্ব্বব্যাপী; আত্মার স্বধর্ম্মই ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম।—(পৃঃ ১১)

*　　*　　*　　*　　*

বিবেক ও বৈরাগ্য—

বিবেক জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার সম্মিলন করে, বৈরাগ্য মনুষ্যকে অনন্ত জীবনের দিকে অগ্রসর করে। বিবেক পাপকে বিনাশ করে, বৈরাগ্য মৃত্যুকে অতিক্রম করে। বিবেক অসত্য হইতে আত্মাকে সত্যস্বরূপে লইয়া যায়। বৈরাগ্য মৃত্যু হইতে

আত্মাকে অমৃতেতে লইয়া যায়। অতএব এই দুয়ের শরণাপন্ন হইলে আমরা নিশ্চয়ই অধ্যাত্ম যোগ দ্বারা অমৃত লাভ করিয়া কৃতার্থ হইতে পারি।—(পৃঃ ১৯)

বিবেক যেমন আত্মাকে পাপ হইতে মুক্ত করিয়া, পবিত্র করিয়া, সত্য-স্বরূপ ঈশ্বরের জন্য প্রস্তুত করে; বৈরাগ্য সেইরূপ আত্মাকে মোহ ও সংসারাসক্তি হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া পরলোকের জন্য, অনন্ত জীবনের জন্য প্রস্তুত করে।—(পৃঃ ২৩)

কত শত লোকের মৃত্যু হইতেছে, কত জনপদ বিলুপ্ত হইতেছে, রাজ্য ও রাজা বিনষ্ট হইতেছে, কত সবল শরীর রোগ ও ব্যাধির আধার হইতেছে, কত উচ্চপদারূঢ় ব্যক্তিরা দুঃখ দারিদ্র্যে পতিত হইতেছে; কত ধনাঢ্য ব্যক্তি নির্ধন হইয়া অন্ন-বস্ত্রাভাবে বিলাপ করিতেছে; এ সকল ঘটনা চতুর্দ্দিক হইতে উচ্চৈঃস্বরে জীবন ও সংসারের অনিত্যতা ঘোষণা করিতেছে। কিন্তু ভ্রান্ত প্রমাদী বিষয়-লোলুপ মানব শুনিয়াও শুনে না; বারংবার এ সকল দর্শন করিলেও চৈতন্য লাভ করে না।—(পৃঃ ২৩)

যাহারা ধন ঐশ্বর্য্য মান মর্য্যাদাতে তৃপ্তি সুখ অন্বেষণ করে, তাহাদের মন কি প্রকারে পরলোকের প্রতি আকৃষ্ট হইবে, যে লোকে ধন ঐশ্বর্য্য, মান মর্য্যাদা পাইবার সম্ভাবনা নাই।—(পৃঃ ২৪)

মনে বৈরাগ্য না জন্মিলে, হৃদয়ে ঈশ্বরের অনুরাগ স্থান না পাইলে, মনুষ্য কখনই পরলোকের জন্য ব্যস্ত হয় না।—(পৃঃ ২৫)

বৈরাগ্য মৃত্যুকে বিনাশ করত ইহলোক ও পরলোককে একত্রী ভূত করিয়া অনন্ত জীবনের স্রোত অসীমরূপে প্রসারিত করে। ইহার নিকট এ জীবন অনন্ত জীবনের এক ক্ষুদ্র কণা বলিয়া প্রতীয়মান হয়, ইহা অনন্ত সাগরের একটী তরঙ্গ মাত্র; সুতরাং ধীর ব্যক্তিরা

ইহলোককে সর্ব্বস্ব মনে না করিয়া এখানে অনন্তকালের জন্য সম্বল আহরণ করেন। মাতৃগর্ভে অবস্থানকালে যেমন ইহ জীবনের ক্ষুদ্র অংশ এবং মনুষ্য-শরীর যেমন ক্ষুদ্র জরায়ু মধ্যে প্রস্তুত হইয়া সংসারে অবতীর্ণ হয়; আমাদের আত্মাও সেইরূপ শৈশবাবস্থায় এই ক্ষুদ্র সংসারে কিছুদিন অবস্থিতি করিয়া বৈরাগ্য সহকারে পরলোকের জন্য প্রস্তুত হয় এবং অনন্ত জীবনের যোগ সাধন করে।—(পৃঃ ২৫)

যে ব্যক্তি ব্রহ্মনিষ্ঠ ও ঈশ্বরসর্ব্বস্ব হইয়া ইহলোক ও পরলোকে কেবল তাঁহাকেই চায়, সেই বিরাগী।—(পৃঃ ২৬)

মৃত্যুকে পরলোকের দ্বার জানিয়া ইহাকে তিনি উপেক্ষা করেন।—(পৃঃ ২৭)

*　　*　　*　　*　　*

প্রার্থনা—

যদি ঈশ্বরকে হৃদয়ের সহিত চাও, তাহা হইলে তিনি প্রার্থনা গ্রাহ্য করিবেন।—(পৃঃ ৩৫)

প্রার্থনাই স্বর্গরাজ্যের স্তম্ভ।—(পৃঃ ৩৭)

*　　*　　*　　*　　*

পরলোক—

কিন্তু ধন্য সেই সাধক যিনি জীবনের সন্ধ্যাকালে, এই প্রকার শান্ত ভাবে, এই প্রশান্ত নদী পার হইয়া, পরলোকে গমন করেন।—(পৃঃ ৪৮)

ঈশ্বর প্রাণ ভক্তেরাই কেবল মৃত্যুতে শান্তি লাভ করেন। মৃত্যুভয় তাঁহাদের পক্ষে নিতান্ত অসম্ভব। বাস্তবিক মৃত্যু কেবল পরলোকের দ্বার মাত্র।—(পৃঃ ৪৯)

মৃত্যুর ভয়ই যথার্থ মৃত্যু। ইহলোক ছাড়িয়া পরলোকে যাওয়া,

ইহাতে আশঙ্কার কারণ কি আছে? ইহলোক পরলোক এক রাজ্যের ভিন্ন ভিন্ন দেশ মাত্র, এক ভবনের ভিন্ন ভিন্ন ঘর মাত্র। এখানেই থাকি, আর যেখানেই যাই, সেই এক রাজা, এক পিতার নিকটে আমরা থাকিব। তবে মৃত্যুকে ভয় কি? পরলোককে একটী বহুদূরস্থ অপরিচিত অন্ধকার স্থান মনে করা কল্পনা মাত্র। এ কল্পনা তোমরা পরিত্যাগ কর, যাহা সত্য তাহা ধারণ কর। যে সকল ভ্রাতা ভগিনী ইহলোক হইতে অপসৃত হইয়াছেন, তাঁহারা কোথায় গেলেন ইহা আলোচনা করিয়া ভীত হওয়া বা ক্রন্দন করা বৃথা। এই ভবনদী পার হইলেই পরলোক। আমরা যেমন এ পারে জীবিত রহিয়াছি, মৃত ভ্রাতা ভগিনীদিগের আত্মা সকল সেইরূপ পরপারে জীবিত রহিয়াছে; মধ্যে কেবল এই নদী ব্যবধান। আমরা যত লোককে এখান হইতে বিদায় দিয়াছি, তাঁহারা সকলেই ঐ স্থানে অবস্থিতি করিতেছেন, এবং তাঁহারাও জানিতেছেন যে, আমরা সকলে এপারে বসিয়া আছি। আমরা তাঁহাদের কোন সংবাদ পাই না, তাহাতে কি? পিতা এখানে আমাদের নিকট আছেন, সেখানেও তাঁহাদের নিকট থাকিয়া তাঁহাদিগের মঙ্গল বিধান করিতেছেন। তবে কেবল এপার হইতে ওপারে যাইবার নাম যদি মৃত্যু হইল, তাহা হইলে আমরা কেন ভীত হইব?—(পৃঃ ৪৯)

ঈশ্বর-ভক্তি না থাকাই আমাদের মৃত্যু-ভয়ের কারণ।—(পৃঃ ৫০)

তিনি পরপারে লইয়া গিয়া তাঁহার শান্তি-নিকেতনে তোমাদিগকে স্থান দিবেন এবং অনেক সম্পদ ঐশ্বর্য্য দিয়া তোমাদিগকে কৃতার্থ করিবেন। (পৃঃ ৫২)

* * * * *

জীবন্ত বিশ্বাস—

সংসারের কষ্ট বিপদে মঙ্গলময়কে বিশ্বাস করাই তোমাদের জীবনের শান্তি সুখ।—(পৃঃ ৫৫)

যদি ঈশ্বর তোমাদিগকে দুঃখানলে দগ্ধ করেন, ঘোর বিপদে নিক্ষেপ করেন, তখন মনে করিও না যে, ঈশ্বর তোমাদিগকে ছাড়িয়াছেন। তিনি বিপদ দ্বারা আত্মাকে প্রস্তুত ও উপযুক্ত করেন।—(পৃঃ ৫৬)

* * * * *

অশ্রুপাত করিয়া বপন—

তাঁহার ধর্ম্মরাজ্যে যে ব্যক্তি অশ্রুপাত করিয়া বপন করে, সে নিশ্চয়ই আনন্দের সহিত শস্য সংগ্রহ করে।—(পৃঃ ৫৮)

ক্রন্দনই আনন্দের সোপান। যিনি প্রথমে ক্রন্দন করিয়া ধর্ম্মজীবন আরম্ভ করেন, আনন্দ তাঁহার শেষ পুরস্কার হয়। যে পরিমাণে ক্রন্দন, সেই পরিমাণে আনন্দ। ধর্ম্মরাজ্যে ক্রন্দনও স্বাভাবিক, আনন্দও স্বাভাবিক।—(পৃঃ ৫৯)

ক্রন্দন করিতে করিতে যে প্রার্থনা করা হয়, তাহাই অবিকৃত ও সরল।—(পৃঃ ৬০)

স্বর্ণ একবার অগ্নিতাপে তাপিত না হইলে কখনই বিশুদ্ধ মূর্ত্তি ধারণ করে না, হৃদয়ে আঘাত না করিলে তাহা হইতে অমৃত-প্রবাহ প্রসূত হয় না, অগ্রে কণ্টক-শয্যায় শয়ন করিয়া শোণিতপাত না হইলে আনন্দ লাভ অসম্ভব।—(পৃঃ ৬৩)

* * * * *

ঈশ্বর অন্তরে—

ঈশ্বরই কেবল শান্তির আধার।—(পৃঃ ৬৭

*   *   *   *

ঈশ্বরের পিতৃত্ব, নর নারীর ভ্রাতৃত্ব এবং ভগ্নীত্ব—

রোগের সময় ঔষধ, শোকের সময় সান্ত্বনা, পরীক্ষার সময় বল, বিপদে শান্তি, মনে সুখ, শরীরে সুখ, তিনিই বিধান করেন।—(পৃঃ ৮৫)

সকলে শ্মশানে পরিত্যাগ করিয়া যাইবে, যাহাদিগকে এত আত্মীয় বলি তাহারা একবার ফিরিয়াও দেখিবে না, প্রিয়তম বন্ধুরা আর সংবাদ লইবেন না, কিন্তু দয়াময় পরমপিতা মৃত্যুকালেও সন্তানকে ছাড়েন না, তাঁহার শান্তি ক্রোড়ে তাহাকে লইয়া পরলোকে গমন করেন।—(পৃঃ ৮৮)

তিনি সুখ সম্পদে রাখুন, অথবা দুঃখ বিপদে নিমগ্ন করুন, সকল সময়ে সকল অবস্থাতে আমরা যেন তাঁহার অনুগত থাকি; তিনি যাহা বলিবেন তাহাই করিব, যাহা ত্যাগ করিতে বলিবেন তাহাই ছাড়িব, যে পথে লইয়া যাইবেন সেই পথে চলিব।—(পৃঃ ৮৮)

তাঁহার সমুদয় আজ্ঞা পালনের নাম ধর্ম্ম।—(পৃঃ ৮৯)

*   *   *   *   *

পাপক্ষয়—

বল, জীবনের সমস্ত দিন এরূপে যাপন করিয়াছি যে, মৃত্যু-শয্যায় সে সমস্ত দিন স্মরণ করিয়া আর পাপ-ভয়ে ভীত হইব না।—(পৃঃ ৯৬)

*   *   *   *   *

ব্যাকুলতা—

তিনি সর্ব্বদা অমৃত পান করাইবার জন্য প্রস্তুত রহিয়াছেন, কেবল তোমাদের চাওয়ার অপেক্ষা।—(পৃঃ ১১৬)

একবার পিতা বলিয়া ডাক, তিনি স্বয়ং আসিয়া সন্তানের তাপিত

হৃদয় শীতল করিবেন। আমাদিগের পিতা এমন নহেন যে, তিনি ব্যাকুল সন্তানের ক্রন্দন শুনিয়া উদাসীন থাকিবেন বা আমাদের দুঃখ দেখিয়া নির্দ্দয় ব্যবহার করিবেন।—(পৃঃ ১১৬)

তাঁহার চরণে ব্যাকুল হৃদয়ে অবলুণ্ঠিত হও। দয়াময় তোমাদিগকে শান্তি দিবেন।—(পৃঃ ১২০)

অদ্যকার অন্ধকার মধ্যে শোকে আকুল হইয়া বিলাপ কর, কল্য পিতার প্রসাদে সুপ্রভাত দেখিবে, তাঁহাকে দর্শন করিয়া জন্ম সফল করিবে, বিমলানন্দে পূর্ণ হইবে। প্রথমে একবার দুঃখী বেশ ধারণ কর, ব্যাকুলতার পথে প্রবেশ কর, ক্রমে সেই পথে যতই যাইবে, ততই আনন্দ ও শান্তি লাভ করিবে।—(পৃঃ ১২০)

*　　*　　*　　*　　*

বিনয়—

স্বর্গরাজ্যের দ্বার অধিক উচ্চ নহে, যদি প্রবেশ করিতে চাও, মস্তক অবনত কর; গর্ব্বিত ভাবে মস্তক উন্নত করিয়া যদি যাও, আঘাত পাইবে এবং প্রবেশ করিতে পারিবে না। যে দ্বার ধর্ম্মাভিমানীদিগের প্রতি অবরুদ্ধ, তাহা দীন-হীন শাকান্ন ভোজী পর্ণকুটীরবাসীদের সমাগমে উন্মুক্ত হয়, এবং ঈশ্বরের প্রেম আসিয়া সেই সামান্য ব্যক্তিদিগকে আলিঙ্গন করে। ধনী মানী জ্ঞানী তাঁহাকে না পাইয়া ফিরিয়া আইসে, কিন্তু দুঃখী বিনয়ী সন্তানকে তিনি দর্শন দিয়া কৃতার্থ করেন। অতএব, হে ভ্রাতৃগণ, বিনয়ী হও, যদি ঈশ্বরকে চাও, অবনত মস্তকে তাঁহার নিকট প্রার্থনা কর।—(পৃঃ ১২৪)

ঈশ্বর যদি দেহ মনের আশ্রয় ও প্রাণ হইলেন, তিনি বিশেষরূপে আত্মার প্রাণ। আমাদের আধ্যাত্মিক জীবন, ধর্ম্ম-জীবন তিনি ভিন্ন থাকিতে পারে না।—(পৃঃ ১২৬)

বিনয়ীরা কেমন স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করিয়া স্বর্গীয় জ্যোৎস্নাতে আলোকিত ও পুলকিত হইতেছে ।—(পৃঃ ১২৮)

ঈশ্বর বিনা ধন দারিদ্র্য, সম্পদ বিপদ, জ্ঞান অজ্ঞান, বল দুর্ব্বলতা, জীবন মৃত্যু, ধর্ম্ম অধর্ম্ম; ঈশ্বর বিনা সংসার শ্মশান সমান।—(পৃঃ ১২৯)

* * * * *

বিশ্বাস—

শরীর সম্বন্ধে চক্ষু যেমন, আত্মা সম্বন্ধে বিশ্বাস সেইরূপ।—(পৃঃ ১৩০)

এই বিশাল বিশ্বের শোভা ও শিল্পনৈপুণ্য, ভূলোকে গম্ভীর গিরি পর্ব্বত, সুবিস্তৃত সাগর বক্ষ, বিচিত্র তরুরাজি, সুকোমল পুষ্পমালা, এবং মনুষ্য-হস্তরচিত সভ্যতা ও সুখের সহস্র নিদর্শন, দ্যুলোকে অসীম আকাশ, তেজোময় সূর্য্য, সুস্নিগ্ধ চন্দ্রমা, অগণ্য গ্রহ তারা, এ সমুদয় অন্ধ ব্যক্তির নিকটে কিছুই নহে, তাহার পক্ষে ইহার সত্তাই নাই। আধ্যাত্মিক জগৎ অবিশ্বাসীর নিকটে এইরূপ। উহার সত্য সকল জাজ্বল্যরূপে দীপ্যমান, উহার সুন্দর শৃঙ্খলা ও শাসন-প্রণালী স্পষ্টরূপে প্রকাশ পাইতেছে, কিন্তু অবিশ্বাসী কিছুই দেখিতে পায় না। ঈশ্বর, পরলোক ও ধর্ম্ম উহার নিকট অসৎ। সে চক্ষু খুলিয়া দেখে চারিদিকে কেবল জড় পদার্থ, কোথাও ঈশ্বর নাই; যতই তাঁহাকে অনুধাবন করে, ততই কেবল শূন্য ও অন্ধকার দেখে। আবার নিমীলিত নয়নে সে যখন আত্মার মধ্যে প্রবেশ করে, সেখানেও সেই অন্ধকার দেখে। অন্ধের যেমন দুর্দ্দশা, তাহারও সেইরূপ দুর্দ্দশা।—(পৃঃ ১৩০)

অবিশ্বাসীর পক্ষে মৃত্যু একটী অভেদ্য প্রাচীর, তাহার অপর দিকে যে কিছু আছে বা থাকিতে পারে, ইহা সে মনে করিতে পারে না,

কেন না, সে অন্ধ। সে মনে করে, মৃত্যুকালে জীবনের দীপ একেবারে নির্ব্বাণ হইয়া যায়, সংসার-ক্রীড়া নিঃশেষিত হয়। যতই সে পরকাল ভাবিতে যায়, ততই অন্ধকারে জড়িত হয়। কিন্তু বিশ্বাসীর নেত্র মৃত্যুর প্রাচীর অতিক্রম করিয়া পরলোকে ধর্ম্ম-রাজ্যের বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্য সন্দর্শন করে।—(পৃঃ ১৩২)

সংসারে পাপ পুণ্য, সুখ দুঃখ, ইহার মধ্যে বিশৃঙ্খলা দেখিয়া অবিশ্বাসী সংশয় অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয় এবং ধর্ম্মকে অস্বীকার করে; কিন্তু বিশ্বাসী ব্যক্তি পরলোকের সঙ্গে ঐহিক তাবৎ ব্যাপারের সুন্দর যোগ দেখিয়া এবং ধর্ম্মাধর্ম্মের সহিত উহার ফলাফলের অনিবার্য্য কার্য্য-কারণ-সম্বন্ধ দেখিয়া পাপ হইতে বিরত হন ও ধর্ম্মপথে অগ্রসর হন।—(পৃঃ ১৩২)

ঈশ্বর, পরলোক ও ধর্ম্ম, যাহা অবিশ্বাসীরা ছায়া ও অন্ধকার জ্ঞান করে, তাহা বিশ্বাসীর নিকট উজ্জ্বল, জীবন্ত এবং সার।—(পৃঃ ১৩২)

সমস্ত হৃদয়ের সহিত মানিতে হইবে যে, তিনি পূর্ণ, মঙ্গলের আধার, তিনি কখনই অমঙ্গল করেন না ও করিতে পারেন না। তাঁহার স্বভাব মঙ্গলময়।—(পৃঃ ১:৪)

যদি সহস্র দুঃখ বিপদ আমাদিগকে আক্রমণ করে, তথাপি পিতার দয়ার উপর আমরা কখনই অবিশ্বাস করিতে পারি না। আমরা বুঝি, আর না বুঝি, সেই দুঃখ বিপদের মধ্যে পিতা আমাদের মঙ্গল সাধন করেন। তিনি সুখেই রাখুন, আর দুঃখেই রাখুন, তিনি যাহা করেন, সকলই আমাদের মঙ্গলের জন্য।—(পৃঃ ১৩৪)

পিতা হস্তে করিয়া যাহা দিবেন, সম্পদই হউক আর বিপদই হউক, অবনত মস্তকে তাহা গ্রহণ করিবে।—(পৃঃ ১৩৫)

সুখের সময় ত সকলে তাঁহাকে স্বীকার করিতে পারে, কিন্তু

পরীক্ষাতে কেবল বিশ্বাসীরা তাঁহার অনুগত থাকেন এবং অটল ভাবে দাসত্ব-ব্রত পালন করেন।—(পৃঃ ১৩৫)

ভবিষ্যতের জন্য ভীত হইও না, ভাবিত হইও না, কিন্তু বিশ্বাসী হইয়া তাঁহার মঙ্গল চরণে পড়িয়া থাক, বিপদ সম্পদ হইবে, দুঃখান্ধকারে সুখ-জ্যোৎস্না দেখিবে, এবং মৃত্যুতে জীবন লাভ করিবে।—(পৃঃ ১৩৬)

যাঁহার মঙ্গল হস্ত তোমাদের মস্তকের উপরে, তাঁহাকে বিশ্বাস চক্ষে দেখ, ভয়ানক বিপদেও তোমরা ব্যাকুলিত হইবে না; বরং তোমাদের উৎসাহ, বল, সাহস ও আনন্দ প্রবর্দ্ধিত হইবে। যখন বিপদের অমানিশা চতুর্দ্দিক অন্ধকারে আচ্ছন্ন করে, একটীও আশা-তারা হৃদয়াকাশে লক্ষিত হয় না, যখন পিতা মাতা বন্ধু বান্ধব সকলে পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করেন, যখন প্রলোভন ও পরীক্ষা মুখ-ব্যাদনপূর্ব্বক গ্রাস করিতে উদ্যত হয় এবং জীবন ভয় দুঃখে মৃতপ্রায় হয়, তখন ভক্ত গম্ভীরস্বরে কেবল এই কথা বলেন, "তুমি আছ, হে ঈশ্বর, তুমি আছ।" এই কথা বলিতে বলিতে চারিদিক ঈশ্বরের পবিত্র মঙ্গল-জ্যোতিতে আলোকিত হয়, দুঃখ ভয়ের অন্ধকার বিদূরিত হয়, সেই সাধকের শরীর রোমাঞ্চিত ও সঞ্জীবিত হয় এবং তাঁহার আত্মা স্বর্গীয় উৎসাহ ও আনন্দে পরিপূর্ণ হয়।—(পৃঃ ১৩৬)

"তুমি আছ" বলিবা মাত্র তিনি প্রকাশিত হইবেন এবং তোমাদিগকে বিঘ্ন বিপদ পরীক্ষা প্রলোভন হইতে উদ্ধার করিবেন। —(পৃঃ ১৩৭)

ঈশ্বর পিতা—

সামান্য ধর্ম্মজ্ঞানের সঞ্চার হইবা মাত্র আমরা দেখিতে পাই, এ সংসারে কেহ আপনার নাই, সকলেই অপরিচিত। কেবল একজন

আত্মীয়রূপে বিদ্যমান থাকিয়া হৃদয়কে আকর্ষণ করেন; তিনি আমাদের পরম পিতা।—(পৃঃ ১৪০)

সঙ্কট রোগে পড়িয়া, যখন আমরা নিরাশ হই, এবং পার্থিব পিতা মাতা বন্ধু বান্ধব আর উপায় নাই দেখিয়া আমাদিগকে পরিত্যাগ করেন, যখন মৃত্যু নিকটবর্ত্তী হইয়া ভয় প্রদর্শন করে, তখন কে মৃত্যু-শয্যায় বসিয়া আমাদিগকে শান্তি দান করেন? হৃদয় বলে, সেই করুণার সাগর পিতা।—(পৃঃ ১৪১)

এমন পিতাকে ভক্তি করিলে ইহকালে কল্যাণ ও পরকালে নিত্য শান্তি লাভ হয়।—(পৃঃ ১৪৬)

ঈশ্বর রাজা—

তাঁহার ধর্ম্মরাজ্য সম্বন্ধেও এইরূপ। ইহার দুই বিভাগ, ইহলোক ও পরলোক। ইহলোক অতি সঙ্কীর্ণ, কিন্তু ইহাই কেবল আমাদের নয়ন-গোচর হয়। যে প্রশস্ত বিভাগ পরলোকে, তাহা আমরা কিছুই দেখিতে পাই না। এই উভয়ের সমষ্টি ধর্ম্মরাজ্য। এ পৃথিবীতে ধর্ম্মরাজ্য শেষ হয় না, মৃত্যুতে ধর্ম্মশাসনের পরিসমাপ্তি হয় না। এখানে ধর্ম্মশাসন আরম্ভ হয়, পরলোকে ইহার সম্পূর্ণতা হয়; সুতরাং পরলোক ছাড়িয়া কেবল এই ক্ষুদ্র সংসারে দৃষ্টিকে বদ্ধ করিলে আমরা ধর্ম্মরাজ্যের পূর্ণ বিচার উপলব্ধি করিতে পারি না।—(পৃঃ ১৫০)

এখানে আমরা অনেক অবিচার দেখিতে পাই। কত পুণ্যাত্মা দুঃখ দুর্দ্দশায় নিপতিত, কত অসাধু সুখ-সিংহাসনে অধিরূঢ়, কত পাপী চিরজীবন পাপ করিয়া অপর্য্যাপ্ত সুখ সম্পদ সম্ভোগ করিয়া অক্লেশে ইহলোক হইতে অপসৃত হয়। কিন্তু পরলোকের প্রতি দৃষ্টি করিলে উহা আর অবিচার বলিয়া বোধ হয় না। এখানে যাহা কিছু বিশৃঙ্খলা

বোধ হয়, মৃত্যুর পর তাহার সামঞ্জস্য হইবে; এখানে যাহা অন্যায় দেখা যায়, পরে তাহা সংশোধিত হইবে; ইহলোকের দণ্ড পুরস্কারের যে সমুদয় অনিয়ম দেখা যাইতেছে, ইহা পরলোকে পূর্ণভাব প্রাপ্ত হইবে। পুণ্যের পুরস্কার ও পাপের দণ্ড ঈশ্বরের ধর্ম্মরাজ্যে উপযুক্ত পরিমাণে প্রদত্ত হইবেই হইবে। যিনি পরম ন্যায়বান্ রাজা, তাঁহার রাজ্যে অবিচার হইতে পারে না; অধার্ম্মিকের শ্রীবৃদ্ধি ও ধার্ম্মিকের দুর্দ্দশা কি সে রাজ্যে থাকিতে পারে? পুণ্যাত্মাদিগকে পূর্ণ পুরস্কার তিনি দিবেনই, পাপীদিগের প্রত্যেক সূক্ষ্ম পাপ তিনি বিচারে আনিবেনই। —(পৃঃ ১৫১)

বিচারের অসীম কাল সম্মুখে প্রসারিত রহিয়াছে, একদিন অবশ্যই নিষ্পত্তি হইবে; এস্থানে না হয়, পরলোকে হইবে, কিন্তু কেহ চির-কালের জন্য নিষ্কৃতি পাইবেন না।—(পৃঃ ১৫১)

বাস্তবিক ইহলোক ও পরলোক একত্র করিয়া না দেখিলে ধর্ম্ম-রাজ ঈশ্বরের শাসন-প্রণালী অপূর্ণ ও দূষিত বোধ হয়; কিন্তু যখন উভয় নয়নগোচর হয়, তখন সংশয়-অন্ধকার তিরোহিত হয়; এবং আমরা দেখি, তাঁহার জড়রাজ্য যেমন নির্দ্দিষ্ট ও অপারবর্ত্তনীয় নিয়মে শাসিত হইতেছে, তাঁহার ধর্ম্মরাজ্যও সেইরূপ সুন্দর চির-প্রতিষ্ঠিত শাসনের অধীন।—(পৃঃ ১৫২)

সত্যং শিবং সুন্দরং—

ঈশ্বরের রাজ্য কোথায়? নাস্তিকেরা বলিবে, অন্ধকার ও কল্পনায় সে রাজ্য। কিন্তু আস্তিকেরা বলিবেন, ঈশ্বরের রাজ্য প্রেমরাজ্য। —(পৃঃ ১৮৯)

তিনি আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, কাহার মনে কি শোক আছে, বল। কে পুত্র হইয়া আমার ক্রোড়ে স্থান লাভ করিবে? অমনই

পুত্রেরা তাঁহাকে চারিদিকে বেষ্টন করিল, বলিল, আমার এই দুঃখ আছে, আমার এই দুঃখ আছে। মা, দুঃখ দূর কর, আমি তোমার কোলে যাইয়া শীতল হইব। অমনই মা সেই দুঃখ-অগ্নি নির্ব্বাণ করিয়া দিলেন। মাতা কোলে লইলেন।—(পৃঃ ১৮৯)

কিন্তু ইহা জানি যে, কাঁদিলে তিনি কাহাকেও নিরাশ করেন না। এমনই আমাদিগের পিতা দয়াময় যে, যে ব্যক্তি যাহা চাহে, তাহাকে তিনি তাহাই দেন।—(পৃঃ ১৯১)

বিবেক ও ভক্তি—

মনুষ্যের আত্মা ঈশ্বরের সহবাসে থাকিবার জন্য সংসৃষ্ট, তাহাতেই তাহার উদ্যম, স্ফূর্ত্তি ও আনন্দ, সংসারের শুষ্ক ভূমিতে রাখিলে অমর আত্মা কখনও জীবিত থাকিতে পারে না।—(পৃঃ ২০৭)

ঈশ্বরের চরণই তাঁহার মুক্তি, তাহাই তাঁর বিপদ কালের সহায়, ইহকালের ধন ও পরকালের সম্বল।—(পৃঃ ২০৯)

এই প্রকারে ভক্ত আত্মা ঈশ্বরের সহবাসে থাকে, চারিদিকে ঈশ্বরকে রাখিয়া দেয়। এক নিমেষ তাঁহা হইতে অন্তর হইলে মৃত্যু। তাঁহাকে ছাড়িয়া অত্যন্ত সাধু কার্য্যও মৃত্যু, তাঁহাকে সঙ্গে রাখিলে সামান্য কার্য্যও জীবন।—(পৃঃ ২১৩)

ঈশ্বরের বিশেষ করুণা—

তাঁহার কাছে দুঃখ প্রকাশ করিলে তিনি দুঃখের দুঃখী হইয়া সান্ত্বনা আনিয়া দেন।—(পৃঃ ২২৬)

তাঁহাকে হৃদয়ে বসাইয়া রাখ, মনের সকল বাসনা পূর্ণ হইবে। তিনি ইহকাল পরকাল চিরকালের জন্য আমাদিগের হইবেন।

ভ্রাতৃগণ, তাঁহাকে নিজের বলিয়া জান। তিনি নিজের সন্তান বলিয়া আমাদিগের সকল দুঃখ দূর করিবেন।—(পৃঃ ২২৭)

আচার্য্যের উপদেশ—দ্বিতীয় খণ্ড।

শ্রীধর স্বামী নাইডুকে উপদেশ—

তাঁহার পবিত্র বিদ্যমানতা আপনার পথের আলোক হইবে, পরীক্ষা বিপদের মধ্যে তাঁহার বল আপনার বর্ম্ম হইবে।—(পৃঃ ৪)

ভক্তি—শ্রীচৈতন্য—

ভক্তিবলে আত্মা মধ্যাহ্ন সূর্য্যের ন্যায় উজ্জ্বল আলোকে সুশোভিত হয়।—(পৃঃ ১৩)

তীর্থভ্রমণ কর, আর যাহাই কর, ঈশ্বর হৃদয়ে আছেন।—(পৃঃ ২০)

ঈশ্বর চিরনূতন, তাঁহার ধর্ম্ম চিরসরস—

সেইরূপ যে ধর্ম্ম আত্মারূপ ভূমিতে রোপিত হইয়াছে, তাহা যেমন এক দিকে সুদৃঢ়, অন্য দিকে তেমনই সুমধুর ফল প্রসব করে। ইহা স্বয়ং ঈশ্বর-হস্ত-সংরচিত এবং তিনিই ইহাতে জল সেচন করেন। তিনিই ইহার প্রাণের প্রাণ।—(পৃঃ ২৬)

আত্মা ও পরমাত্মার যোগ—

ব্রাহ্মধর্ম্ম যোগের ধর্ম্ম। ইহার সাহায্যে আমরা আত্মাকে গূঢ়রূপে পরমাত্মার সঙ্গে যোগ করিতে পারি।—(পৃঃ ২৬)

বৃক্ষের মূল যেমন ভূমিতে গুপ্ত থাকে, তেমনই ধর্ম্মের মূল আত্মার অতি গভীর ও নিভৃত স্থানে প্রতিষ্ঠিত আছে। (পৃঃ ২৭)

জীবাত্মা উপযুক্ত সাধন দ্বারা পরমাত্মাতে বদ্ধমূল হইয়া, তাঁহার প্রসাদ-বারি সিঞ্চনে আপনার পুষ্টিসাধন করেন এবং অনন্তকাল বর্দ্ধিত হইতে থাকেন।—(পৃঃ ২৭)

যোগ ভিন্ন ঈশ্বরকে অনন্তকালের জন্য লাভ করা যায় না। ইন্দ্রিয় দ্বারা যেমন বহির্জগতের সঙ্গে আমাদের যোগ স্থাপন হয়, আত্মার সঙ্গে সেইরূপ কতকগুলি আধ্যাত্মিক বৃত্তি দ্বারা ঈশ্বরের যোগ হয়।—(পৃঃ ২৭)

একদিকে সংসার, অপরদিকে ঈশ্বর, মধ্যে আমাদের আত্মা। —(পৃঃ ২৭)

পরমেশ্বর আত্মার মধ্যে এমন একটী শক্তি সন্নিবেশিত করিয়া দিয়াছেন, যাহাতে আত্মা আকাশে উড্ডীয়মান হইয়া তাঁহার সহবাসের শান্তি উপভোগ করত জীবনকে কৃতার্থ করিতে পারে।—(পৃঃ ২৮)

আধ্যাত্মিক রাজ্য দৃষ্টি করিবা মাত্র দেখি, মনোমধ্যে ঈশ্বরের সত্য জ্যোতি কোটী সূর্য্য পরাজয় করিয়া বিরাজ করিতেছে।—(পৃঃ ২৮)

কেবল যাঁহাদের ভক্তি আছে, তাঁহারা অবশ্য বলিবেন যে, আত্মার দ্বারা ঈশ্বরকে উপলব্ধি করা যায়। যদি তাহা না হইত, তাহা হইলে কোন্ শান্তি-সরোবরে গিয়া হৃদয়কে শীতল করিতাম? মনে কর, যখন রোগ দুঃখে জর জর হই, তখন যদি জননীর মুখ একবার দেখিতে পাই, তাহা হইলে হৃদয়ের কষ্টগুলি কেমন দূর হইয়া যায়। সেইরূপ আত্মার শত শত কষ্ট আছে। সেই সময় যদি পিতার মুখ দেখিতে না পাই, তাহা হইলে বোধ হয় যেন, পৃথিবীতে আমাদের কোন প্রয়োজন নাই। কিন্তু বিশ্বাস আমাদের হস্তে থাকিলে ঈশ্বরের সঙ্গে সহজেই যোগ হইবে।—(পৃঃ ২৯)

ব্রাহ্মধর্ম্ম শান্তি সংস্থাপনের জন্য অভ্যুদিত—

শান্তি সংস্থাপন করাই ব্রাহ্মধর্ম্মের বিশেষ ভাব।—(পৃঃ ৩৯)

তিনি এক হস্তে মুখের অন্ন, অপর হস্তে আত্মার অন্ন বিধান করিতেছেন। এক হস্তে শরীরকে রোগ হইতে রক্ষা করিতেছেন, অপর হস্তে আত্মাকে পাপ মলিনতা হইতে মুক্তি দিতেছেন।—(পৃঃ ৪৫)

তিনি আমাদের হৃদয়-রাজ্যের ধন, সে রাজ্যের সার শোভা। —(পৃঃ ৪৭)

আত্ম-তত্ত্ব—

আমরা পরলোকের যাত্রী, আমরা জীবন পথের পথিক।—(পৃঃ ৪৮)

কিন্তু যাহা আত্মার মধ্যে দেখিবে, তাহার শেষ নাই, যাহা হৃদয়ের মধ্যে সঞ্চার করিবে, তাহা চিরস্থায়ী। মৃত্যুর পর পৃথিবীর কার্য্যাড়ম্বরের শেষ হইবে; কিন্তু অন্তরের ধন অনন্তকাল থাকিবে। বাহিরের সৎকার্য্য শেষ হইবে, কিন্তু অন্তরের প্রণয় চিরস্থায়ী। আত্মার মধ্যে যে বিশ্বাস, বিনয় এবং ব্রহ্ম-দর্শনের আনন্দ পাইতেছ, তাহা চিরস্থায়ী।—(পৃঃ ৪৯)

বাহিরের এ সকল কিছুই নিত্যস্থায়ী নহে; এবং বাহিরের কোন বিষয়ের সহিত আমাদের চির-সম্বন্ধ নাই। এ সকল আধ্যাত্মিক রাজ্যে আরোহণ করিবার সোপান মাত্র। এ সমুদয়ই পরিত্যাগ করিয়া যাইতে হইবে। সংসারের সকল বস্তুর সঙ্গেই বিচ্ছেদ হইবে। —(পৃঃ ৫১)

এক বন্ধু থাকিবেন, যিনি গোপনে আত্মার অভ্যন্তরে সেই রাজ্য প্রকাশ করিবেন, সেখানে নিত্য শান্তি, নিত্য পবিত্রতা। অতএব যে পরিমাণে বাহিরের আকর্ষণ পরিত্যাগ করিতে পারিবে, যে পরিমাণে বাহিরের পদার্থে মুগ্ধ থাকিতে কষ্ট বোধ হইবে, সেই

পরিমাণে আত্মার চক্ষু কর্ণ প্রস্ফুটিত হইবে, এবং সেই পরিমাণে আত্মার প্রকৃত উন্নতি।—(পৃঃ ৫২)

অতএব বলিতেছি, আরও আন্তরিক হও, আরও আধ্যাত্মিক হও। আর বাহিরের উপর নির্ভর করিও না। বাহিক ব্যাপার দূর কর। ঐ দেখ, গম্যস্থান নিকটবর্ত্তী হইতেছে। এই সময় অন্তরের সম্বল চিনিয়া লও। সময় থাকিতে ব্রহ্ম-ধনের সঙ্গে পরিচয় না হইলে মহা বিপদ ঘটিবে।—(পৃঃ ৫২)

কি জন্য ঈশ্বর আমাদের ন্যায় মহাপাপীদিগের নিকট এই স্বর্গের আলোক প্রকাশ করিয়াছিলেন? এই জন্য যে, আমরা তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া, আশা করিয়া, ধর্ম্মরাজ্যে পড়িয়া থাকিতে পারিব।—(পৃঃ ৫৩)

অন্তরে নিঃশব্দে তাঁহাকে মনের কথা বল, তিনি শুনিবেন; অন্তরে ক্রন্দন কর, তিনি তোমার অশ্রু মোচন করিবেন।—(পৃঃ ৫৪)

আধ্যাত্মিক আনন্দ-চন্দ্রকে প্রকাশিত হইতে দাও। যিনি অন্তরের অন্তরে রহিয়াছেন, তাঁহাকে ধারণ করিয়া পরলোকের জন্য সম্বল কর।—(পৃঃ ৫৪)

* * * * *

ঈশ্বর মঙ্গলময়—

মঙ্গলময়ের রাজ্যে অমঙ্গল নাই। কখন অমঙ্গল হইতে পারে না, ঈশ্বর স্বয়ং মঙ্গল-স্বরূপ। তাঁহা হইতে যে কোন ঘটনা, যে কোন ব্যাপার, যে কোন ভাব নির্গত হয়, তাহা মঙ্গলের জন্য। তিনি কেবল যে মঙ্গল বিধান করেন তাহা নহে, অমঙ্গল করা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব।—(পৃঃ ৫৪)

এক দিন মেঘেতে সমুদয় আচ্ছন্ন হইল, আর সূর্য্যের কিরণ

প্রকাশ পায় না, তখন এমন অবোধ কে যে, বলিবে সূর্য্য নাই? যদি সূর্য্য দশ দিন মেঘেতে আচ্ছন্ন থাকে, তথাপি আমরা বিশ্বাস করি, এই মেঘের মধ্যে সূর্য্য বিরাজ করিতেছে। সেইরূপ ঈশ্বর এই গভীর সংসারের অন্ধকার মধ্যে বিরাজ করিতেছেন, যদিও আমাদের মলিন চক্ষু তাঁহাকে স্পষ্ট রূপে দেখিতে পায় না; কিন্তু যখন আমাদিগের আবরণ চলিয়া যাইবে, তখন এই ঘন অন্ধকার ভেদ করিয়া, সেই পরম ঈশ্বরের প্রেমালোক দেখিয়া কৃতার্থ হইব।—(পৃঃ ৫৫)

ঘোর বিপদের মধ্যেও তাঁহার মঙ্গল-চরণ ধারণ করিয়া থাকিতে হইবে। মন্দ অবস্থা উপস্থিত হইল, বিষাদের ঘন মেঘ আসিয়া হৃদয় আচ্ছন্ন করিল, পিতা মাতা, স্ত্রী পুত্র, বন্ধু বান্ধব সকলেই পরিত্যাগ করিলেন, সংসারের ঘৃণা, নির্য্যাতন অন্তর জর্জ্জরিত করিতে লাগিল, শরীর রোগ ব্যাধিতে পরিপূর্ণ হইয়া ভয়ানক যন্ত্রণার আলয় হইয়া উঠিল; সেই বিপদের সময় ভক্ত ভিন্ন আর কে পরমেশ্বরের চরণ ধরিয়া থাকিতে পারেন? ভক্ত যখন সেই বিপদের সময় পরমেশ্বরকে পিতা বলিয়া সম্বোধন করেন, সেই "পিতা" শব্দ কেমন মধুর! তিনি সেই ঘোর বিপদকে জিজ্ঞাসা করেন, বল দেখি, আমার পিতা কি অমঙ্গল করিতে পারেন? সেই বিপদই তাঁহাকে বলিয়া দেয়, তিনি কখনও অমঙ্গল করিতে পারেন না।—(পৃঃ ৫৬)

সংসারে যেমন কখনও আলোক কখনও অন্ধকার, কখনও হর্ষ কখনও বিষাদ, কখনও সুখ কখনও দুঃখ, তেমনি আধ্যাত্মিক রাজ্যে কখনও দিবা কখনও রাত্রি, কখনও প্রসন্নতা কখনও বিষাদ, কখনও ঈশ্বর-দর্শন, কখনও ঈশ্বর-বিচ্ছেদ, কখনও পুণ্যের অভাবে হৃদয় নিতান্ত চঞ্চল, কখনও পুণ্যের সাহায্যে হৃদয় প্রশান্ত ভাব ধারণ করে। আধ্যাত্মিক রাজ্যের ভাব যদি বুঝিতে পারিতাম, কখনই

পিতাকে নির্দ্দয় বলিতাম না। অমুক নিয়ম এখানে এখন পালিত হইতেছে, অমুক নিয়ম তখন ঐখানে পালিত হইয়াছিল, এ সকল স্পষ্টরূপে দেখিতে পাইতাম।—(পৃঃ ৫৮)

ঈশ্বর মঙ্গলময়, মুখে বলিলে হইবে না। কিন্তু যিনি অন্তরে এই দৃঢ় বিশ্বাস রাখিয়া প্রত্যেক অবস্থায় এবং ঘোরতম অন্ধকার মধ্যেও আপনার মনকে প্রফুল্ল রাখিতে পারেন, তিনিই বাস্তবিক নিরাপদ। যতদিন এই প্রকার নির্ভর না হয়, ততদিন জীবনের স্থিরতা হইতে পারে না।—(পৃঃ ৫৯)

বাঁচিয়া থাকি তাহাও মঙ্গল; মরিতে হয় তাহাও মঙ্গল।—(পৃঃ ৫৯)

মৃত্যু এই জন্য যে, তাহা হইতে নব জীবন লাভ করিব; বিপদ এই জন্য যে, সম্পদের মূল্য জানিতে পারিব; অন্ধকার এই জন্য যে, আলোকের প্রয়োজন হৃদয়ঙ্গম করিব; রোগ এই জন্য যে, সুস্থ হইয়া ভালরূপে তাঁহার চরণ সেবা করিতে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হইব। প্রত্যেক ব্যাপারই মঙ্গলপূর্ণ। অতএব যে কোন ঘটনা উপস্থিত হয়, অকুতোভয়ে তাহা বহন কর। বিপদে ভীত হইও না, অন্ধকারে মুহ্যমান হইও না। সুখ দুঃখ, সাময়িক সম্পদ বিপদ, উভয়ই কল্যাণ সাধনের জন্য প্রেরিত হয়; অতএব যাহা কল্যাণ, তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিবে এবং বিপদের মধ্যে অবিচলিত থাকিয়া সেই মঙ্গলময়ের আজ্ঞা অনুসরণ করিবে।—(পৃঃ ৫৯)

* * * * *

লোভ—

কিন্তু যিনি একবার স্বর্গরাজ্যের দ্বার খুলিয়া দেখিয়াছেন যে, আমার পিতার নিকট কত সুখ সঞ্চিত রহিয়াছে, তখনই পৃথিবীর ধন, মান,

সকলই চলিয়া গেল, ঈশ্বরপ্রদত্ত অনন্তকালের বস্তু হৃদয়ে গাথিয়া রাখিলাম।—(পৃঃ ১০২)

যাঁহারা স্বর্গের ধন দেখেন নাই, তাঁহারাই সংসারের রূপে মোহিত হইতে পারেন।—(পৃঃ ১০৫)

পরলোক কত আনন্দে পরিপূর্ণ, তাহা দেখি না, এই জন্যই ইহলোকের সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হই।—(পৃঃ ১০৫)

* * * * *

শুষ্কতা—

যথার্থ ব্রাহ্মের লক্ষণ কি, না তাঁহার আত্মা সর্ব্বদা সরস। শুষ্কতা তাঁহাকে অধিকার করিতে পারে না। ইহকাল, পরকাল, সকল সময় তাঁহার হৃদয় সরস ভাবে পরিপূর্ণ।—(পৃঃ ১২৩)

আত্মা যখন পরমাত্মার মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হয়, তাঁহার সহিত যখন জীবন-যোগ সম্বদ্ধ হয়, এবং তিনি যখন সমস্ত হৃদয় অধিকার করেন, সেই অবস্থা আমাদের প্রতিজনের প্রার্থনীয়; এবং ইহা ব্রাহ্মের সর্ব্বোৎকৃষ্ট লক্ষণ।—(পৃঃ ১২৪)

জীবনের যে গভীর প্রদেশে ঈশ্বরের রস জীবাত্মার মধ্যে প্রবেশ করিতেছে, মনুষ্যের চক্ষু সেখানে যায় না। যাঁহারা সেই স্থানে গমন করেন, শুষ্কতা তাঁহাদিগকে অধিকার করিতে পারে না।—(পৃঃ ১২৬)

ব্রহ্মরূপ-শান্তি-সরোবরে অবগাহন করিয়া জীবাত্মার সমুদয় গ্লানি প্রক্ষালন করিবে। ব্রহ্মের সহবাসে আত্মাকে শীতল করিতে না পারিলে, আর কিছুতেই শান্তি পাইবে না, তিনিই ভগ্ন হৃদয়ের একমাত্র বন্ধু; তাঁহারই শীতল ছায়ায় সমুদয় অগ্নি নির্ব্বাণ হয়; অতএব তাঁহারই সঙ্গে মধুময় ভক্তি-যোগ সাধন কর।—(পৃঃ ১২৯)

গোপনে ঈশ্বরের সঙ্গে সাক্ষাৎ কর, গোপনে তাঁহার নিকট মনের

বেদনা প্রকাশ কর, তিনিও গোপনে তোমাদের সমুদয় দুঃখ দূর করিবেন।—(পৃঃ ১২৯)

তুমি যদি শান্তি-সরোবর হইয়া অন্তরে রহিয়াছ, তবে আশীর্ব্বাদ কর, যেন তোমাকে দেখিয়া জীবনের সমুদয় দুঃখ ভুলিয়া যাই।—(পৃঃ ১৩০)

* * * * *

শূন্যতা—

ধর্ম্মের অতি আশ্চর্য্য ক্ষমতা। ধর্ম্ম লঘুকে গুরু করে, গুরুকে লঘু করে, শূন্যকে পূর্ণ করে, অন্ধকার মধ্যে জ্যোতি প্রকাশ করে এবং মৃত্যুর মধ্যে জীবন সঞ্চার করে।—(পৃঃ ১৩২)

সাংসারিক লোকের কাছে চার অক্ষর দয়াময় নাম কিছুই নহে; কিন্তু ব্রহ্ম ভক্তের কাছে ইহার ক্ষমতার শেষ নাই, এই নামের মধ্যে তিনি ব্রহ্মাণ্ড হইতেও প্রকাণ্ড বস্তু দর্শন করেন। ইহার বলে, জীবন মৃত্যু, সম্পদ বিপদ, সুখ দুঃখ, সকল অবস্থাই তাঁহার পক্ষে সমান।—(পৃঃ ১৩৩)

অতএব যতক্ষণ না এই আকাশে ঈশ্বরের গম্ভীর সত্তার মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইতে পারি, ততক্ষণ আমাদের যথার্থ শান্তি নাই।—(পৃঃ ১৩৫)

বিশ্বাস-হস্ত প্রসারণ কর, আকাশের মধ্যে ঈশ্বরের চরণ ধারণ করিতে পারিবে।—(পৃঃ ১৩৬)

চারিদিকে তাঁহার গম্ভীর মধুময় সত্তা! ভূলোকে তাঁহার সহবাস, দ্যুলোকে তাঁহার সহবাস, অন্তরে তাঁহার সহবাস, বাহিরে তাঁহার সহবাস, ইহলোকে তাঁহার সহবাস, পরলোকে তাঁহার সহবাস। সেই সহবাস-সাগরে ডুবিলাম, আর দুঃখ নাই, যন্ত্রণা নাই, কেবলই

প্রেমের আনন্দ, ভক্তির আনন্দ, পবিত্রতার আনন্দ। এই প্রার্থনীয় সুখ শান্তির অবস্থা যেন আমরা প্রত্যেকে লাভ করি।—(পৃঃ ১৩৮)

পিতা, আমার আর স্বর্গ কোথায়! হৃদয় মধ্যে যদি তুমি বাস কর, এই আমার স্বর্গ।—(পৃঃ ১৩৯)

যদি ব্রাহ্ম করিলে, ব্রাহ্মধর্ম্মের গুরুত্ব বুঝিতে দাও। যাহাকে লোকে আকাশ বলে, শূন্য বলে, সেখানে তোমার পবিত্র চরণ ধরিয়া প্রাণকে শীতল করিতে ক্ষমতা দাও; যাহাকে লোকে নির্জ্জন বলে, সেখানে তোমার প্রেমমুখ দেখিয়া জীবনকে সফল করিতে সমর্থ কর। তোমার শ্রীচরণতলে চিরকাল বাস করিব। একাকী আছি, মনে করিয়া ভয় করিব না, ঐ চরণতলে শান্তি পুণ্য লাভ করিব। তোমার মধুময় সহবাস হৃদয়ের মধ্যে আনিয়া দাও। আকাশে তোমার শান্তিপূর্ণ সত্তা অনুভব করিতে দাও।—(পৃঃ ১৩৯)

আশীর্ব্বাদ কর, যেন ইহকাল পরকাল আমরা তোমার সহবাসের গভীর শান্তি উপভোগ করিতে পারি।—(পৃঃ ১৩৯)

* * * * *

নামের কত শক্তি—

ঈশ্বরকে দেখিলে যেমন আনন্দ হইবে, তেমনই তাঁহার নামেও আনন্দ হইবে। সেই নাম তাঁহার ভাব উদ্বোধন করিয়া দেয়। নামের প্রতি যদি ভক্তি হইত, আজ ব্রাহ্মদের এই দুর্দ্দশা থাকিত না। নাম ব্রহ্মরাজ্যের দ্বার। এই নাম আপাততঃ দেখিতে ক্ষুদ্র, কিন্তু ইহার মধ্য দিয়া ক্রমশঃ সেই অনন্ত প্রেমসিন্ধু প্রকাশিত হইবে।—(পৃঃ ১৪৭)

যখন আত্মা অবসন্ন হইয়া মৃতপ্রায় হয়, তখন এই নামামৃত পান করিয়া নবজীবন লাভ করি। এই নামের সুমিষ্ট রস পান করিলে

অন্তরের সকল প্রকার বিষাদ দূর হয়। এই নাম-রূপ-জ্যোৎস্না চারিদিকের অন্ধকার তিরোহিত করে।—(পৃঃ ১৪৯)

কৃতজ্ঞতা—

কেবল ইহলোকে আমাদিগকে সুখ দিয়া তিনি ক্ষান্ত হইতে পারেন না। কারণ কেবল ষাট বৎসর আমাদিগকে সুখী করিলে কি হইবে? ইহা তিনি জানেন, এই জন্য তিনি আমাদিগকে অনন্ত-জীবন দান করিতে অঙ্গীকার করিয়াছেন। এখানে কত প্রকারে আমাদের উপকার করিতেছেন, আবার পরকালে আমাদের জন্য কত প্রকার সুখ সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছেন।—(পৃঃ ১৫৭)

একদিনের করুণা ভাবিয়া দেখ, ভয়ানক যন্ত্রণার মধ্যেও শান্তি পাইবে। সময় থাকিতে থাকিতে কৃতজ্ঞতা সাধন করিয়া লও, নতুবা অবশেষে অকৃতজ্ঞ হৃদয় লইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে পরলোকে প্রবেশ করিতে হইবে।—(পৃঃ ১৫৯)

* * * * *

আমি আমার শত্রু, আমি আমার মিত্র—

অন্তরে প্রবেশ কর। আমাদের মনোরূপ ঘরের মধ্যে সেই বিশ্বপতি বিরাজ করিতেছেন।—(পৃঃ ১৬৫)

তোমার কাছে শান্তি পাইবই পাইব, যদি তোমার মুখ দেখি, সকল জ্বালা দূর হইবে, জীবন সফল হইবে। দীনবন্ধু নাম ধরিয়া যখন তুমি পাপীদের কাছে আসিয়াছ, তখন শান্তি দিবেই দিবে।—(পৃঃ ১৬৬)

* * * * *

সত্যযুগের সরলতা—

যেমন বসন্তকালে প্রকৃতির চারিদিকে সকলই নূতন এবং সকলই সুন্দর, সেইরূপ মনুষ্যও এই অবস্থায় সরল শিশুর ন্যায় সেই সর্ব্বাপেক্ষা পরম সুন্দর ঈশ্বরের নিকট গমন করিয়া আশ্চর্য্য শোভা এবং কোমলতা লাভ করে। এই অবস্থা স্বর্গের অবস্থা, ইহাই মনুষ্যের সত্যযুগ।—(পৃঃ ১৬৮)

* * * * *

জীবনের উদ্দেশ্য সাধন—

(হে ঈশ্বর), মৃত্যুর দিন যে কাছে আসিতেছে, এ সময়ে আমাদের কাছে আসিয়া দয়া কর।—(পৃঃ ১৮৯)

* * * * *

ভ্রাতৃপ্রেম—

যখন জন্মগ্রহণ করিলাম, তখনও তাঁহার ক্রোড়ে, এখন যে এত বড় হইয়াছি, এখনও তাঁহার ক্রোড়ে আশ্রিত রহিয়াছি; এবং অনন্তকাল এই ভাবে তাঁহারই সেই পুরাতন ক্রোড়ে সঞ্চরণ করিতে হইবে।—(পৃঃ ১৯৩)

সেই এক পুরাতন পিতা সম্পদে বিপদে, পাপ পুণ্যে, সকল অবস্থায় নিকটে বসিয়া আছেন।—(পৃঃ ১৯৪)

যদি ঈশ্বরের অনুগত হও, তবে এখানেই সেই স্বর্গ আরম্ভ হইবে, যে স্বর্গে অনন্তকাল বাস করিবে।—(পৃঃ ১৯৯)

* * * * *

আত্মার চক্ষু কর্ণ—

স্বভাবতঃ চক্ষু যেমন বাহিরের বস্তু দর্শন করে, এবং কর্ণ যেমন

বাহিরের শব্দ শ্রবণ করে, আত্মাও সেইরূপ আপনার স্বাভাবিক অবস্থায় থাকিলে আধ্যাত্মিক রাজ্যের ব্যাপার সকল উজ্জ্বল রূপে দর্শন করিতে পায়, এবং সেই রাজ্যের মধুময় শব্দ স্পষ্টরূপে শ্রবণ করে।—(পৃঃ ২১০)

চক্ষু কর্ণ পীড়াগ্রস্ত হইলে, যেমন বাহিরের দেখা শুনা কষ্টকর হয়, তেমনই আত্মা যখন বিকৃত হয়, তখন আর স্বর্গের সৌন্দর্য্য দেখিতে পায় না, এবং স্বর্গের বাক্য শ্রবণ করিতে পারে না। ঈশ্বর-দর্শন ঈশ্বরের কথা-শ্রবণ দুই তেমনই স্বাভাবিক, যেমন বাহিরের দর্শন শ্রবণ।—(পৃঃ ২১০)

কিন্তু ঈশ্বর যখন উপদেশ দেন, তখন জ্ঞান বল উভয়ই একত্র হয়। তখন আত্মার মূল-দেশ পর্য্যন্ত আন্দোলিত হয় এবং মন বিকম্পিত হয়। ঈশ্বর যখন কথা কহেন, আমাদের শরীর মন আলোকিত হয়।—(পৃঃ ২১৪)

সেই কোলাহল-শূন্য শান্তি-রাজ্যে প্রবেশ কর, প্রতিদিন উপদেশ আসিবে। শরীর মধ্যে রক্ত যেমন আপনি চলিতেছে, তেমনই ব্রহ্ম সত্যরূপ রক্ত হইয়া তোমাদের আত্মার মধ্যে সঞ্চালিত হইবেন।—(পৃঃ ২১৫)

* * * * *

একমাত্র গুরু পরব্রহ্ম—

তাঁহার সেই স্বর্গীয় সর্ব্বোৎকৃষ্ট ভাষাতে তিনি স্বয়ং পরিত্রাণার্থী সন্তানের নিকট সেই (মুক্তি) শাস্ত্র ব্যক্ত করেন।—(পৃঃ ২২৫)

প্রথমতঃ সেই প্রত্যাদেশের দ্বারা ঈশ্বর আমাদিগকে জ্ঞান দান করেন, দ্বিতীয়তঃ ইহার দ্বারা তিনি আমাদের অন্তরে শান্তি দেন।—(পৃঃ ২২৫)

তাঁহাকে দেখিলে যেমন অন্তর জ্ঞান এবং শান্তিতে পরিপূর্ণ হয়, তাঁহার কথা শুনিলেও তেমনই আমরা যুগপৎ জ্ঞান এবং সুখ লাভ করি। ব্রহ্ম স্বয়ং গুরু হইয়া জীবাত্মাকে আপনার শিষ্যের ন্যায় আদরের সহিত মধুময় উপদেশ দেন, ইহা শুনিলেও হৃদয় উল্লসিত হয়।—(পৃঃ ২২৬)

অন্তরের মধ্যে এমন একজন আছেন, যাঁহার একটী কথাতে জীবনের যন্ত্রণা চলিয়া যায়।—(পৃঃ ২২৯)

*　　*　　*　　*　　*

ধ্যান—

নির্জ্জনে সজনে, সম্পদে বিপদে তিনি সর্ব্বদাই কাছে থাকেন, এই জন্য যে, পাছে আমরা তাঁহাকে না দেখিয়া ভীত হই।— (পৃঃ ২৩১)

জগতের সমস্ত নিকৃষ্ট ব্যাপার পরিত্যাগ করিয়া ঈশ্বরের আধ্যাত্মিক রাজ্যে (যেখানে সর্ব্বদাই আনন্দ এবং যাহা শান্তি পুণ্যের প্রস্রবণ) প্রবেশ করিতে হইবে। যাঁহারা সেই দিন এখানে উপনীত হইতে চাহেন, তাঁহাদিগকে নিমন্ত্রণ করিতেছি। এখানে পিতার মুখ কেমন সুন্দর দেখিবেন। এখানে শান্তি-সরোবরে অবগাহন করিয়া বহুকালের দুঃখ দূর করিবেন।—(পৃঃ ২৩৩)

এই উৎসবে এমন কোন মধুর সরোবর দেখাইবেন, যাহার জল স্পর্শ করিলে জীবন শীতল হইবে। পিতা এমন কোন বৃক্ষতলে লইয়া যাইবেন, যাহার ছায়ায় বসিয়া ফল ভোগ করিলে কত মৃত ব্যক্তি অনন্ত জীবন পাইবে।—(পৃঃ ২৩৪)

*　　*　　*　　*　　*

ঈশ্বর-ইতিহাসে—

যদি প্রতিদিন শয়ন করিবার পূর্ব্বে দেখিতে পাও যে, মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত রহিয়াছ, তবেই হাসিতে হাসিতে পিতার নাম করিয়া পরলোকে যাইতে পারিবে।—(পৃঃ ২৪১)

অনন্যগতি হইয়া তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ কর, ঘোর বিপদের মধ্যেও তিনি সহায় হইবেন, মৃত্যু-সঙ্কট তাঁহার হুঙ্কারে পলায়ন করিবে। —(পৃঃ ২৪২)

*　　*　　*　　*　　*

পরলোক-সাধন—

আমাদের একদিকে মৃত্যু, অন্যদিকে অমৃত; একদিকে পৃথিবী, অন্যদিকে স্বর্গ; একদিকে সংসার, অন্যদিকে ঈশ্বর। ইহার মধ্যে আত্মা বাস করে। একদিকে শরীররূপ মন্দির মধ্যে আত্মা, আর একদিকে ব্রহ্মরূপ মন্দির মধ্যে আত্মা—একদিকে দেহগত আত্মা, অন্যদিকে ব্রহ্মগত আত্মা। এই আত্মা ব্রহ্ম এবং শরীর উভয়ের মধ্যে থাকিয়া দুই দিক হইতেই জীবনের প্রয়োজনীয় অন্ন জল গ্রহণ করে। যদি নিমেষের জন্য দেহের সঙ্গে আত্মার যোগ না থাকে, তৎক্ষণাৎ সেই দেহের মৃত্যু হয়; দৈহিক জীবন কি, তাহা কাহাকেও বুঝাইয়া দিতে হয় না। ইহা বৃক্ষ, পশু এবং মনুষ্যদিগের মধ্যে সাধারণ। কিন্তু মনুষ্যের নিকট এই জীবন আত্মার অধীন। ইহা আত্মার আদেশ পালন করে এবং আত্মার অভিলাষ চরিতার্থ করে। নানা দেশ হইতে বিবিধ সামগ্রী সকল আনিয়া এই জীবনের ভৃত্য সকল আত্মার মনোরথ পূর্ণ করে। সেই সমস্ত ভৃত্য কে? শরীরের ইন্দ্রিয়। এই ইন্দ্রিয় সকল আত্মাকে কত প্রকার সুখে সুখী করে। যে আত্মা এই সুখে মোহিত হয়, তাহার মৃত্যু হইলে শরীরের মৃত্যু হয়; কারণ

শরীর মৃত্যুর প্রতিকৃতি, এবং শরীরের সুখও অনিত্য। আর এক দিকে দেখ, আত্মা ঈশ্বরের সঙ্গে বাস করে; যেমন ইন্দ্রিয়দিগের মধ্য দিয়া আত্মা সংসারের সঙ্গে আলাপ করে এবং পৃথিবীর সভ্যতা এবং সুখ সামগ্রী উপভোগ করে, সেইরূপ বিশ্বাস এবং আশা দ্বারা আত্মা পরলোক এবং ঈশ্বর-সহবাসের গভীর আনন্দ আস্বাদন করে।—(পৃঃ ২৪৩)

যে আত্মা শরীরের মধ্যে, সেই আত্মাই পরমেশ্বরের মধ্যে। এই যোগ কেমন গূঢ় যোগ, বাক্য তাহা প্রকাশ করিতে পারে না। একই আত্মা দুই প্রকার ব্রত পালন করিতেছে, দুই প্রকার সুখ ভোগ করিতেছে। একই মনুষ্য দুই জগতে বাস করিতেছে। যেমন শরীরের দ্বারা সংসারের যোগ, তেমনই আর এক দিকে বিশ্বাসের দ্বারা পরলোক এবং ব্রহ্মের সঙ্গে যোগ। জীবাত্মা যখন ঈশ্বরে বাস করে, আত্মার সেই অবস্থাই পরলোক।—(পৃঃ ২৪৩)

ইন্দ্রিয় না থাকিলে যেমন সংসারের সঙ্গে যোগ হয় না, সেইরূপ বিশ্বাস ভক্তি না থাকিলে ঈশ্বর এবং পরলোকের সঙ্গে যোগ হয় না। —(পৃঃ ২৪৪)

শরীরস্থ আত্মা যেমন সমস্ত বহির্জগৎ প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করে, এবং ইচ্ছামত উপভোগ করে, সেইরূপ পরব্রহ্মবাসী আত্মা এই রাজ্য স্পষ্টরূপে উপলব্ধি করে।—(পৃঃ ২৪৫)

বিশ্বাস, ভক্তি এবং আশার মধ্য দিয়া ব্রহ্মরূপ রাজ্যে প্রবেশ কর, কি দেখিবে? পরলোক এবং পারলৌকিক সুখ।—(পৃঃ ২৪৫)

শরীরী আত্মার সঙ্গে সময়ের সম্বন্ধ; কিন্তু ব্রহ্মের মধ্যে জীবিত যে আত্মা, তাহার সঙ্গে অমৃতের যোগ। তাহাই আত্মার অনন্ত জীবন এবং পরলোক। কল্পনার ব্যাপার নহে, কিন্তু পরব্রহ্মের মধ্যে যে

আমাদের অবস্থিতি, তাহাই পরলোক; আত্মার এই অবস্থাই যথার্থ জীবন এবং ইহাই প্রকৃত যোগ। যতই ব্রহ্মের চরণে অবস্থিতি করিব, ততই পরলোক উজ্জল দেখিব এবং পরলোক স্মরণ মাত্র হৃদয় আনন্দে উৎফুল্ল হইবে। ভ্রাতৃগণ, এইরূপে পিতার চরণ সাধন কর, এই পৃথিবীর মধ্যে থাকিয়া অমরত্ব আস্বাদন করিতে পারিবে।—(পৃঃ ২৪৫)

ধন্য সেই ব্রাহ্মের আত্মা, যিনি ঈশ্বরের মধ্যে জীবিত! তাঁহার নিকট এক নূতন রাজ্য আবিষ্কৃত হয়। অনন্তকাল তাঁহার সম্মুখে, যতই তিনি পরলোক-রাজ্যে বাস করিতে শিক্ষা করেন, ততই তাঁহার ব্রহ্ম-সাধন গাঢ়তর হয়, ততই তিনি ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ সহবাসের গভীর আনন্দ অনুভব করেন।—(পৃঃ ২৪৬)

কিন্তু পরলোক আমাদের শান্তি-নিকেতন, পরলোক আমাদের পিতৃগৃহ, তাঁহার চরণে নিত্য শান্তি, নিত্য সুখ। ভ্রাতৃগণ! সেই গৃহে চল, সকল দুঃখ দূর হইবে, প্রাণ শীতল হইবে। এক সূর্য্য এখানে মিট মিট করিতেছে; কিন্তু পিতার রাজ্যে যে স্বর্গের আলোক, তাহার তুলনায় ইহা অন্ধকার বইত নয়। এখানে পাপ, মলিনতা, বিষাদ, কিন্তু পিতার গৃহে কত রাশি রাশি পুণ্য, কত সুখ, কত আনন্দ। এখানে এই বিষয় হইল, এই বিষয় চলিয়া গেল, কিন্তু পরলোকে কিছুরই অন্ত নাই। অনন্তকাল সেখানে ধূ ধূ করিতেছে, পিতার অনন্ত প্রেম সেখানে অবিশ্রান্ত প্রবাহিত হইতেছে, যত ইচ্ছা সেই সুধা পান কর, ক্ষয় নাই। পিতা স্বয়ং আসিয়া সেখানে সন্তানদিগের প্রাণ শীতল করেন। অতএব সেই স্থানে যাইবার জন্য যত প্রকার কষ্ট সহ্য করিতে হয়, আহ্লাদের সহিত তাহা বহন কর।—(পৃঃ ২৪৭)

শরীরের জীবন কিছুই নহে; ঈশ্বরে জীবনই জীবন। যদি সেই জীবন পাই, তবে শান্তি-পুষ্পে সাজ্জত হইয়া কত সুখী হই।—(পৃঃ ২৪৮)

যখন পরলোক স্মরণ মাত্র তোমাদের হৃদয় আনন্দে প্লাবিত হইবে, তখনই বুঝিতে পারিবে, পরলোক তোমাদের পিতৃগৃহ এবং পরলোক তোমাদের শান্তি-নিকেতন।—(পৃঃ ২৪৮)

আচার্য্যের উপদেশ—তৃতীয় খণ্ড।

আত্মার গঠন সামাজিক—

মনুষ্যের আত্মার গঠন সামাজিক। আত্মা নিরবলম্ব হইয়া একাকী বাস করিতে পারে না।—(পৃঃ ৬)

আত্মা জনসমাজ হইতে বিছিন্ন হইয়া কদাচ একাকী উন্নত হইতে পারে না।—(পৃঃ ৬)

ঈশ্বর আত্মার প্রাণ, এই জন্য আমরা স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞান দ্বারা পরলোকে বিশ্বাস করি। কারণ যখন প্রাণ-স্বরূপ পিতার চরণে অধিষ্ঠান করি, তখন শরীর-বিহীন হইলেও অনন্ত কাল জীবিত থাকিব, এই বিশ্বাস সহজেই আত্মার গূঢ়তম স্থানে প্রকাশিত হয়। চিরকাল প্রাণের প্রাণ ঈশ্বরের ঘরে বসিয়া তাঁহার অভয় চরণ দর্শন করিব। মৃত্যুর সাধ্য নাই সেই ঘরে প্রবেশ করে, পবন সেখানে যাইতে পারে না, অগ্নির কোন শক্তি নাই সেখানকার কোন দ্রব্য দগ্ধ করে। ঈশ্বর জীবনের জীবন এই সত্য বুঝিতে পারিলে সেই আশা অন্তরে বদ্ধমূল হয়। এইরূপে ঈশ্বরের সঙ্গে যেমন প্রতি আত্মার নিগূঢ় প্রাণ-যোগ, তেমন আবার তাঁহার সৃষ্ট অন্যান্য আত্মার সঙ্গেও ইহা বিশেষ বিশেষ সম্পর্কে আবদ্ধ। সকলকে ছাড়িয়া যিনি ঈশ্বরের নিকট যাইতে চাহেন, নিশ্চয়ই তিনি নিরাশ হইয়া ফিরিয়া আসিবেন।—(পৃঃ ৭)

আত্মা যতই গভীররূপে এই অমৃত পান করে, ঈশ্বরের এমনই নিগূঢ় করুণা, ততই প্রবল বেগে ইহার মধ্যে উদারতা এবং প্রেম সঞ্চারিত হয়।—(পৃঃ ৮)

*　　*　　*　　*　　*

স্বর্গীয় পরিবার—

সমস্ত জগতের জন্য তিনি এক ঘর নির্ম্মাণ করিতেছেন। যদি শান্তি চাও, সকলেই এই ঘরে প্রবেশ কর। আবার দেখ, ভবনদী পার হইবার জন্য একটী তাঁহার নির্ম্মিত ঘাট, তাহার নাম ভক্তি-ঘাট। যদি পরিত্রাণ চাও, এই ঘাটেই আসিতে হইবে। ঐ দেখ, এই ঘাটে পিতার চরণতরী রহিয়াছে।—(পৃঃ ৩৫)

*　　*　　*　　*　　*

ধ্যান—

জড় জগৎ হইতে আধ্যাত্মিক দেশে প্রবেশ করিতে গেলে প্রথমে অন্ধকার, কিছুই দেখা যায় না, না জড়-রাজ্যের চন্দ্র সূর্য্য, না হৃদয়-রাজ্যের সুশীতল পবিত্র পদার্থ; কিন্তু আশাপূর্ণ হৃদয়ে ধৈর্য্য ধারণ করিলে, ক্রমেই সেই গভীর অন্ধকার ভেদ করিয়া, ঈশ্বরের প্রেমোজ্জ্বল সত্তা স্পষ্টরূপে প্রকাশিত হয়। যেমন বাহিরের জগৎ বাহিরের ইন্দ্রিয়ের দ্বারা প্রকাশিত হয়, তেমনই সেই অন্তরতম চিরজাগ্রত পুরুষ, আত্মার অন্তরতম ভক্তি-চক্ষুর নিকট বিদ্যমান।—(পৃঃ ৩৭)

একাগ্রচিত্তে তদ্গত ভাবে বিষয় রাজ্য হইতে ক্রমে চলিয়া যাও, অন্ধকারের পর অন্ধকার, তাহার পর অন্ধকার, গভীর হইতে গভীর-তর অন্ধকার এবং তাহা অপেক্ষাও ঘোরান্ধকার অতিক্রম করিয়া চলিয়া যাও, ভয় নাই, নিরাশ হইও না, শীঘ্র কাজ সারিয়া লইব এরূপ মনে করিও না; কিন্তু শান্ত ভাবে ধীরে ধীরে সেই পুণ্যালয়ের দিকে

গমন কর, কিছু দূর গেলেই দেখিবে, কেমন সুন্দর সেই মঙ্গলময়ের প্রেমরাজ্য।—(পৃঃ ৩৮)

* * * * *

ব্রাহ্মদিগের শাস্ত্র—

ব্রহ্মবাণী শুনিবা মাত্র মৃতপ্রাণে জীবন সঞ্চারিত হয়।—(পৃঃ ৪৪)

প্রত্যাদেশ মনুষ্যের কল্পনা নহে; কিন্তু ইহা জীবাত্মার অন্তরে সত্যস্বরূপ ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ আদেশ।—(পৃঃ ৪৪)

যাঁহারা মৃতপ্রায়, তাঁহাদিগকে বলি, ব্রহ্মের কথা শ্রবণ কর, জীবিত হইবে। যাঁহারা দুর্ব্বল, তাঁহাদিগকে বলি, ব্রহ্মের কথা শুন, বলীয়ান্ হইবে। এক ঈশ্বরের মুখ হইতে একই কথা আসিতেছে। ভ্রাতৃগণ, ভগ্নীগণ, সকলে মিলিয়া সেই কথা শুন, এবং সেই কথা পালন করিয়া, চল আনন্দ মনে স্বর্গরাজ্যে চলিয়া যাই।—(পৃঃ ৪৬)

* * * * *

দীক্ষিতদিগের প্রতি উপদেশ—

পাপ-বিকারে তিনি তোমাদের মুক্তি, মৃত্যুশয্যায় তিনি তোমাদের একমাত্র সুহৃদ্ এবং শেষ গতি।—(পৃঃ ৪৮)

বিপদের সময় তাঁহার অভয় মূর্ত্তি দেখিয়া পরিত্রাণ পাইবে।—(পৃঃ ৪৮)

দয়াময়, দয়াময় বলিয়া চলিয়া যাও, বলিতে বলিতে দেখিবে, শুষ্ক বৃক্ষে প্রেম-ফুল সকল ফুটিবে, অসত্য কল্পনা পলায়ন করিবে; অন্ধকারের মধ্যে আলোক প্রকাশিত হইবে এবং মৃত ব্যক্তিরা পুনর্জ্জীবিত হইয়া উঠিবে।—(পৃঃ ৪৮)

* * * *

ঈশ্বর আত্মাতে—

আমার শরীর আত্মা যেমন আমার, তেমনই এ সকল আমার ঈশ্বরের। যখন দেখি, আমার এই পাপাত্মার সঙ্গে সেই ধর্ম্মাধিপতি ঈশ্বরের এইরূপ গূঢ় প্রাণ-যোগ, তখন পরকালে কিরূপে বাস করিব বুঝিতে পারি, তখন অনন্ত জীবন এবং আত্মার অমরত্ব কি, তাহা প্রকাশিত হয়।—(পৃঃ ৭৭)

* * * * *

ঈশ্বর অন্তর্জগতে—

সত্য, প্রেম, পবিত্রতা, যিনি এই তিন পদার্থে পরিপূর্ণ, তাঁহারই নাম ব্রহ্ম। আমরা ব্রহ্মের সন্তান, এ জন্যই আমরা তাঁহার জ্ঞান, প্রেম এবং পবিত্রতার অধিকারী। এই তিন পদার্থেই জীবাত্মার সঙ্গে পরমাত্মার যোগ।—(পৃঃ ৭৯)

শরীর এবং মন যেমন তাহাদের প্রত্যেক শক্তির জন্য সকল শক্তির মূলাধার সেই প্রাণ-স্বরূপ ঈশ্বরের শরণাগত হয়, সেইরূপ তাহা অপেক্ষা অধিক পরিমাণে ধর্ম্ম-জীবন ঈশ্বরের উপর নির্ভর করে।—(পৃঃ ৮২)

* * * * *

নারী জাতির অধিকার—

নির্জ্জনে বসিয়া যখন জিজ্ঞাসা করি, আমরা কি জন্য জন্ম ধারণ করিলাম, এই পৃথিবীর মধ্যেই কি চিরকাল আমাদিগকে বাস করিতে হইবে? তখন দেখিতে পাই, এই যে সংসারের অতুল বৈভব এবং অপার ঐশ্বর্য্য, এ সকল আমাদের জন্য নহে, অচিরেই এ সকল পরিত্যাগ করিয়া আমাদিগকে এক অদৃশ্য এবং অজানিত রাজ্যে প্রবেশ করিতে

হইবে। তখন স্পষ্ট দেখিতে পাই, পৃথিবীর ধন ধান্য ভোগ করিবার জন্য আমরা এই সংসারে আসি নাই। আমাদের জীবনের লক্ষ্য স্বতন্ত্র এবং এই পৃথিবীতে তাহা সিদ্ধ হইতে পারে না। এইরূপে যখন উজ্জ্বলরূপে জীবনের উদ্দেশ্য প্রকাশিত হয়, এই কথোপকথনের তাৎপর্য্য তখনই সমক্যরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি। তখন দেখিতে পাই, মৃত্যুর পর পৃথিবীর কোন বস্তুর সঙ্গেই সম্পর্ক থাকিবে না। কারণ পৃথিবীর কিছুই মনুষ্যাত্মার নিত্যকাল ভোগ করিবার জন্য নহে।—(পৃঃ ৮৮)

কিছুদিন ঐহিক সুখ সম্ভোগ করিয়া জীবন অতিবাহিত করিবার জন্য আমরা পৃথিবীতে আসি নাই; কিন্তু যাহাতে অনন্তকাল সুখ শান্তি লাভ করিতে পারি, সেই সম্বল সঞ্চয় করিবার জন্যই আমরা পৃথিবীর এ সকল অনিত্য ধন ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইয়াছি।—(পৃঃ ৮৯)

যাহা দ্বারা আমরা অমর হইতে পারি, তাহাই আমরা গ্রহণ করিব।—(পৃঃ ৮৯)

এই সংসারে থাকিয়াই আমাদিগকে অনন্ত জীবনের আস্বাদ লাভ করিতে হইবে।—(পৃঃ ৮৯)

পৃথিবীর অনিত্য সুখ পরিত্যাগ করিয়া অনন্ত জীবনের উদ্দেশ্য সাধন করিবে, এ বিষয়ে কে তোমাদের প্রতিকূল হইবে? এই পথে ঈশ্বর স্বয়ং তোমাদের সহায়, তিনি তোমাদের নেতা, এবং তিনিই তোমাদের লক্ষ্য।—(পৃঃ ৯১)

আত্মার সহজ অবস্থাই স্বাধীনতা। সমুদয় পাপ বন্ধন হইতে উন্মুক্ত হইয়া আত্মা যখন সহজেই অমরত্ব কামনা করে এবং সেই অমৃতস্বরূপে বিচরণ করে, আত্মার সেই গোপনীয় অবস্থাই যথার্থ স্বাধীনতা।—(পৃঃ ৯১)

অতএব পাপ এবং মৃত্যুকে অতিক্রম করিয়া যাহাতে তোমরা প্রকৃত স্বাধীনতা এবং অমরত্ব লাভ করিতে পার, তাহাই আমাদের প্রার্থনীয়।—(পৃঃ ৯১)

অমরত্ব আমাদের লক্ষ্য এবং অমরত্বই আমাদের জীবনের প্রয়োজন।—(পৃঃ ৯১)

আবার বলিতেছি, এই অমরত্বে সকলের সমান অধিকার এবং এ বিষয়ে কেহই কাহারও অধীন নহে।—(পৃঃ ৯১)

ব্রহ্মমন্দির আমাদের আত্মার কল্যাণের জন্য। এখানে আসিয়া আমরা অনন্ত জীবনের মধুরতা এবং আধ্যাত্মিক স্বাধীনতা উপভোগ করিব।—(পৃঃ ৯৪)

*   *   *   *   *

ব্রহ্মদর্শন সহজ বিশ্বাসমূলক—

যতক্ষণ ব্রহ্মকে স্পষ্টরূপে দেখিতে না পাও, নিশ্চয় জানিও, ততক্ষণ আত্মার মৃত্যু।—(পৃঃ ১০৩)

সেই অরূপ-মাধুরী দেখিবার জন্যই জীবাত্মা সৃষ্ট হইয়াছে, এবং ঈশ্বর এখন যে আমাদিগকে পাপের এত কঠোর শাস্তি বিধান করিতেছেন, তাহা এই জন্য যে, একদিন আমরা নির্ম্মল হইয়া তাঁহার সাক্ষাৎ দর্শন লাভ করিব।—(পৃঃ ১০৩)

জড়-জগতের অতীত স্থান এই আকাশে জগতের ঈশ্বর প্রাণেশ্বরের সাক্ষাৎ পাইতেছি। বায়ু দ্বারা নাসিকায় নিশ্বাস প্রশ্বাস, আত্মার ভক্তির দ্বারা তেমনই সহজ ভাবে ঈশ্বরের বর্ত্তমানতা উপভোগ করিতেছি।—(পৃঃ ১০৫)

ঈশ্বরের সঙ্গে জীবাত্মার ব্যবধান নাই।—(পৃঃ ১০৫)

*   *   *   *   *

জীবন সার, জীবন সৎ—

কারণ, যে পর্য্যন্ত উপাসনার স্রোত স্থায়িভাবে এবং গূঢ়রূপে আত্মার মধ্যে প্রবিষ্ট না হয়, সে পর্য্যন্ত তোমাদের পদে পদে ভয় এবং বিপদের কারণ রহিয়াছে। অতএব যদি নির্ভয় হইতে চাও, অবিশ্রান্ত প্রার্থনা এবং উপাসনা কর।—(পৃঃ ১০৮)

* * * * *

সরস উপাসনা—

তাঁহার দয়াল স্বভাব সাধন কর। দেখিবে, অচিরেই তাঁহার শান্তিপূর্ণ পরম সুন্দর পবিত্র প্রেমরাজ্য তোমাদের নিকট প্রকাশিত হইবে। যতই সেই রাজ্যে প্রবেশ করিবে, ততই তোমরা পবিত্র আনন্দে পরিপূর্ণ হইবে।—(পৃঃ ১১৮)

* * * * *

স্বর্গরাজ্য—

যেখানে ভাই ভগিনী নাই, কেবলই অন্ধকারপূর্ণ নির্জ্জনতা, তাহা স্বর্গ নহে, তাহা কল্পনা। ঈশ্বরের স্বর্গরাজ্য তাঁহার পুত্র কন্যাদিগের দ্বারা পরিপূর্ণ।—(পৃঃ ১২৯)

* * * * *

মুসলমান ধর্ম্মের নিকট ঋণী—

সুখের সময় যেমন তিনি দয়াময় পিতা, দুঃখের সময় তিনি আরও নিকটস্থ সহায় এবং আদরের ধন। অতএব কোন সময় তাঁহাকে ছাড়িও না।—(পৃঃ ১৩৭)

* * * * *

নিরাশা—

ধর্ম্মরাজ্যের প্রাতঃকাল নিত্য প্রাতঃকাল, ধর্ম্মরাজ্যের বসন্ত চির-বসন্ত, আধ্যাত্মিক যৌবনের অবসান হয় না। সেই চিরপুরাতন ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা কর, যেন অনন্তকাল তাঁহার নিকট বালকের মত হইয়া থাকিতে পার।—(পৃঃ ১৪৩)

ব্রহ্মরাজ্যে বার্দ্ধক্য নাই, সেই নিত্য প্রেমধামে সায়ংকাল নাই, সেই পুণ্যলোকে শীত নাই, তথায় অন্ধকার নাই, রজনী নাই। চিরকাল সেখানে নিত্য বসন্ত, নিত্য যৌবন, নিত্য প্রাতঃকাল। আর কেন তবে এমন সুন্দর পিতা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া শুষ্ক হও। প্রার্থনা করি, ঈশ্বর চিরদিন তোমাদের বসন্তকাল রক্ষা করুন।—(পৃঃ ১৪৩)

*　　*　　*　　*　　*

যোগী ব্রাহ্ম—

কিন্তু যাঁহার আত্মা ব্রহ্মযোগে যোগী, তিনিই যথার্থ ব্রাহ্ম।—(পৃঃ ১৪৪)

ব্রাহ্মদিগের মন্দির নাই, তীর্থ নাই, ধর্ম্মশাস্ত্র নাই, গুরু নাই, অবতার নাই। ইষ্ট সাধন করিবার জন্য বাহিরের কোন অবলম্বনই নাই। তাঁহাদের উপাস্য দেবতা কোন গৃহ কিম্বা স্থানে বদ্ধ নহে। এই জন্য নিরুপায় ব্রাহ্ম বাহ্য জগৎ হইতে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন হইয়া সেই ইন্দ্রিয়াতীত আধ্যাত্মিক রাজ্যে প্রবেশ করেন, সেখানে উপস্থিত হইয়া দেখেন, "সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্। চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্॥" সেই অদৃশ্য রাজ্য দেখিবা মাত্র, নিরাশ্রয় ব্রাহ্মের সমুদয় দুঃখ ঘুচিয়া যায়। সেখানে গিয়া এমন মন্দির এবং এমন গুরু লাভ করেন, যাহার তুলনায় জগতের সমুদয় দেব-

মন্দির এবং সমুদয় আচার্য্য উপাচার্য্য কিছুই নহে। সেখানে অবতারের প্রয়োজন হয় না; কিন্তু সাধক সাক্ষাৎ ঈশ্বরকে দর্শন করেন। সেই অন্ধকারাচ্ছন্ন হৃদয়-রাজ্যে (যেখানে চন্দ্র সূর্য্য কিছুই উদিত হয় না) আত্মারূপ জগতের মধ্যে তিনি যোগের সাধন লাভ করেন, সেই নিগূঢ় স্থানে বহির্জগতের কোন উপকরণেরই প্রয়োজন হয় না। আত্মা সেই ঘোরান্ধকার মধ্যে ঈশ্বরের স্বর্গীয় পুণ্যালোকে উজ্জ্বল এবং তেজস্বী হয়। সাধকের সঙ্গে তথনই ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ যোগ সংস্থাপিত হয়। যথন উপাস্য দেবতার সঙ্গে সৃষ্ট হৃদয়ের এইরূপ সংযোগ হয়, তথন বহির্জগতের সঙ্গেও আত্মার নূতন সম্পর্ক সংস্থাপিত হয়। তথন চক্ষু, কর্ণ ইত্যাদি ইন্দ্রিয় সকল আস্তিক হইয়া সমুদয় পদার্থে ঈশ্বরের জ্বলন্ত সত্তা অনুভব করে। এইরূপে আত্মা যতই ঈশ্বরের অব্যবহিত সন্নিধানে অনুপ্রবিষ্ট হয়, ততই ইহা প্রগাঢ় আনন্দ-রসে আপ্লুত হয়। এই যোগ কিয়ৎকালের জন্য ক্ষণস্থায়ী যোগ নহে, কিন্তু ইহা গূঢ়তম চিরস্থায়ী প্রাণের যোগ।—(পৃঃ ১৪৪)

যিনি ঈশ্বরের প্রতি গূঢ়রূপে অনুরক্ত, তিনি স্থির এবং প্রশান্ত, কারণ তিনি সর্ব্বদাই তাঁহার আত্মার গভীরতম স্থানে সেই সুগম্ভীর পুরুষের সাক্ষাৎ লাভ করেন।—(পৃঃ ১৪৬)

ভক্তেরা এজন্যই হৃদয়ের এত আদর করেন, কারণ ঈশ্বর স্বয়ং সেখানে চিরবদ্ধ হইয়া অধিষ্ঠান করেন। এইরূপে নিজের অন্তরের মধ্যে যথন সেই অনন্তকালের সম্বল, নিত্য সঙ্গী পরমেশ্বরকে লাভ করিবে, তথন আর ভয় নাই। যাঁহার আত্মা এই অবস্থা লাভ করিয়াছেন, তিনিই ব্রহ্ম-প্রাণে প্রাণী, তিনিই যোগী এবং তিনি বাস্তবিক ব্রাহ্ম।—(পৃঃ ১৪৯)

* * * * *

প্রচারক কে—

যাঁহারা পূর্ণ বিশ্বাসী এবং ঈশ্বরের আজ্ঞাধীন, তাঁহারা স্বর্গ হইতে প্রচুর প্রেমান্ন এবং শান্তিবারি লইয়া, দেশে দেশে যাইয়া, পিতার দুঃখী সন্তানদের ক্ষুধা এবং তৃষ্ণা দূর করেন; শক্রতা মিত্রতা নির্ব্বিশেষে সকলের নিকট তাঁহারা দয়াব্রত এবং প্রেমব্রত পালন করেন।—(পৃঃ ১৫৭)

*   *   *   *   *

সংসার ও ধর্ম্ম—

যে সকল ব্রাহ্ম আধ্যাত্মিক জ্যোতি—এই অপরূপ দৃশ্য দেখিলেন, তাঁহারা মোহিত হইয়া গেলেন, সংসার তাঁহাদের নিকট সামান্য অকিঞ্চিৎকর বোধ হইল। হাস্য করিতে করিতে তাঁহারা পৃথিবী হইতে বিদায় লইলেন। আবার যখন পরলোকের দিকে তাঁহাদের দৃষ্টি পড়িল, তখন সত্যের রাজ্য, প্রেমের রাজ্য, পুণ্যের রাজ্য অনন্তকাল বিস্তৃত দেখিয়া অন্তরের সহিত, জয় জগদীশ, জয় জগদীশ, বলিয়া আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। চক্ষু মুদ্রিত করিয়া যে নূতন সহর এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে যে সকল ব্যাপার দেখিলেন, আর তাহা ভুলিতে পারিলেন না।—(পৃঃ ১৬৬)

কিন্তু কি সাধু কি অসাধু, কি অন্ধ কি চক্ষুষ্মান্, প্রতি জনকেই একদিন সেই আন্তরিক রাজ্য দেখিতে হইবে, এবং সেই প্রেমাবাসে প্রবেশ করিয়া শান্তি পরিত্রাণ লাভ করিতে হইবে। কিন্তু শীঘ্র না দেখিলে দুঃখ যায় না, অন্তরের গূঢ় পাপ দূর হয় না। এই জন্য, ব্রাহ্মগণ, ব্রাহ্মিকা ভগ্নীগণ! তোমাদিগকে বিনীত ভাবে সম্বোধন করিতেছি, ত্বরায় সেই রাজ্যে চল, তোমাদের শোক তাপ চলিয়া যাইবে। যায় যাক্ সংসারের সুখ, যায় যাক্ পৃথিবীর বন্ধুতা, যায়

থাক্ বাহিরের চন্দ্র সূর্য্য। তোমাদের আলোক অন্তরে, তোমাদের আনন্দ ঈশ্বরের চরণে। বাহিরে প্রসন্নতা থাক্ আর না থাক্, দিন রাত্র প্রফুল্ল মনে ঈশ্বরের জন্য জীবন ধারণ কর এবং তাঁহার কার্য্য করিয়া শান্তি পরিত্রাণ লাভ কর। পিতা মাতা, ভাই বন্ধু, স্ত্রী পুত্র, এই আছেন, এই নাই; কিন্তু ঈশ্বর তেমন আত্মীয় নন যে, তোমাদের বিপদ দেখিয়া নিমেষের জন্য তিনি চলিয়া যাইতে পারেন। অতএব বাহিরের সকল সম্পর্ক ভুলিয়া এবং জগতের স্তুতি নিন্দা অসার জানিয়া, অবিলম্বে সত্যের রাজ্যে চলিয়া যাও। হৃদয়ের মধ্যে সেই নিত্য সঙ্গী ঈশ্বরকে দেখ, ভালরূপে তাঁহাকে চিনিয়া লও। ঘোর বিপদের সময় তিনি ভিন্ন আর কেহই নিকটে থাকিবে না। তাঁহার সঙ্গে যদি পরিচয় হয়, সহস্র অস্ত্রাঘাতে কাতর হইলেও অভয় পদ লাভ করিতে পারিবে। যখন সকল কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইবে, তখন কেবল তিনি আসিয়াই অন্তরে সান্ত্বনা দিবেন।—(পৃঃ ১৬৬)

যদি শান্তি উপভোগ করিতে চাও, তবে সেই পরম বন্ধুকে গ্রহণ কর।—(পৃঃ ১৬৭)

* * * * *

সত্যে সত্যে বিবাদ নাই—

তোমাদের উদ্দেশ্য এক, তোমাদের গম্যস্থান এক।—(পৃঃ ১৭১)

* * * * *

গভীর ধর্ম্ম সাধন—

বৃক্ষের সঙ্গে ভূমির যেমন সম্পর্ক, আত্মার সঙ্গে পরমাত্মার সেইরূপ সম্বন্ধ। বৃক্ষের মূল ভূমিতে, আত্মার জীবন ব্রহ্মে।—(পৃঃ ১৭১)

কিন্তু যথার্থতঃ আত্মার জীবন, বল, আনন্দ, উৎসাহ, প্রত্যাদেশ, শাস্ত্র, সকলই ব্রহ্মের মধ্যে।—(পৃঃ ১৭২)

জীবাত্মার জ্ঞান, প্রাণ, প্রেম, আনন্দ, পবিত্রতা, পরিত্রাণ, সকলই ঈশ্বরের মধ্যে।—(পৃঃ ১৭২)

আত্মা যদি ব্রহ্মে বদ্ধমূল না হইয়া থাকে, পরিবর্ত্তনের মধ্যে কেহই জীবনকে নিষ্কলঙ্ক রাখিতে পারে না।—(পৃঃ ১৭২)

অনেক ব্রাহ্ম চক্ষু মুদিত করিলেই দশ দিক অন্ধকার দেখেন, কিন্তু অন্ধকারের মধ্যে যাঁহারা সেই রাজাধিরাজের সহর দেখিতে পান, তাঁহারাই যথার্থ ব্রাহ্ম।—(পৃঃ ১৭৪)

* * * * *

তিনটী প্রশ্নের মীমাংসা—

অতএব সাবধান হইয়া জীবনের মূলদেশ বিশুদ্ধ কর, অটল সত্যের ভূমি অবলম্বন কর, বিপদের তরঙ্গ, অবিশ্বাসের তরঙ্গ আর তোমাদিগকে বিনাশ করিতে পারিবে না।—(পৃঃ ১৭৭)

স্বর্গের প্রেম দোষ গুণ বিচার করে না; কিন্তু দোষ গুণ নির্ব্বিশেষে ভাই ভগ্নীদিগকে আলিঙ্গন করে।—(পৃঃ ১৮০)

যদি সুখী হইতে চাও, রোগ, শোক, দুঃখ, বিপদ, সকল অবস্থায় ঈশ্বরের সত্য গ্রহণ কর, এবং সেই সত্য পালন করিয়া জীবন পবিত্র কর।—(পৃঃ ১৮২)

* * * * *

বিশ্বাসমূলক প্রেম—

বিশ্বাসে স্বর্গরাজ্য দিন দিন নিকট হইবে।—(পৃঃ ১৯০)

* * * * *

জীবন-পথের পথিক—

জীবন-পথের পথিক আমরা, সকলেই চলিয়া যাইতেছি, পথের মধ্যে কথনও ঝড় বৃষ্টি আসিয়া আমাদের উপর উৎপাত করে, কথনও

সূর্য্যের সহাস্য কিরণ আমাদিগকে পুলকিত করে। কখনও আলোকের মধ্যে, কখনও অন্ধকারের মধ্য দিয়া চলিয়া যাইতেছি। কখনও অন্তরে উৎসাহ এবং আশার অগ্নি প্রজ্বলিত হইতেছে, কখনও নিরাশা, নিরুদ্যম এবং নিরুৎসাহ আসিয়া অন্তরকে একবারে অবসন্ন করিতেছে। কখনও সম্পদ, কখনও বিপদ; কখনও সুখ, কখনও দুঃখ; কখনও প্রসন্নতা, কখনও বিষণ্ণতা; এইরূপ পরস্পর বিপরীত এবং বিরুদ্ধ অবস্থা সকল জীবন-পথে আমাদিগকে আক্রমণ করে। কিন্তু ইহা নিশ্চয় যে, আমরা জীবন-পথের পথিক। সকল অবস্থার মধ্য দিয়া ঐ পথে চলিয়া যাইতেছি, কিন্তু কোথায় যাইতেছি, ইহা অতি অল্প লোকেই জানেন। পৃথিবীর কয়টী লোক অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া নিশ্চয়রূপে এই কথা বলিতে পারেন, ঐ আমাদের গম্যস্থান! একাগ্রতার সহিত আমরা এই পথে ঐ দিকে যাইতেছি, দক্ষিণে বামে পদ বিচলিত হইতে পারে না, কেন না, সম্মুখে ঐ লক্ষ্য দেখা যাইতেছে। ঐ আমাদের গম্যস্থান দিন দিন নিকটতর হইতেছে। ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়া আমরা দিবস যামিনী যাপন করিতে পারি না। একবার এদিকে এক বার ওদিকে, একবার পূর্ব্বে আবার পশ্চিমে, একবার উত্তরে আবার দক্ষিণে, এইরূপ অস্থির ভাবে আমরা জীবন ক্ষয় করিতে পারি না। কিন্তু প্রতিদিন অল্পে অল্পে ঐ সম্মুখস্থ লক্ষ্যের নিকটবর্ত্তী হইতে হইবে। —(পৃঃ ১৯০)

ঈশ্বরের স্বরূপ না জানিয়া উপাসনায় প্রবৃত্ত হওয়া যেমন বিড়ম্বনা, সেইরূপ জীবনের লক্ষ্য না জানিয়া, জীবন-পথে অগ্রসর হওয়া কেবলই ক্লেশাবশেষ। ঈশ্বরের সম্পর্কে যেমন পূর্ণজ্ঞান চাই, জীবনের আদর্শ সম্পর্কেও সেইরূপ পরিপক্ব জ্ঞান আবশ্যক। ঈশ্বরকে যেমন উজ্জ্বল নয়নে দেখিবে, তেমনই কোথায় যাইতেছি, আমাদের লক্ষ্য কি,

তাহাও স্পষ্টরূপে জানিতে হইবে। লক্ষ্য সম্পর্কে অস্থিরতা, কল্পনা কিম্বা সংশয় থাকিলে সকল শ্রম বিফল হইবে, এবং পশ্চাৎ অনুতাপ করিতে হইবে। অতএব অগ্রেই যথাসময়ে লক্ষ্য স্থির করিয়া সত্য পথে বিচরণ করিব।—(পৃঃ ১৯১)

যদি পরিত্রাণ চাও, সত্যের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে।—(পৃঃ ১৯২)

সাধক বিনীতভাবে ঈশ্বরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তিনি স্বয়ং গুরু হইয়া এই কথা বলিলেন, "যে স্বর্গধামে আমি বাস করি, অবশেষে যেখানে তোমরা সকলেই যাইবে, সেই স্বর্গধাম নির্জন, শূন্য নহে, কিন্তু সেখানে আমার পুত্র কন্যা সকল বিরাজ করেন"।—(পৃঃ ১৯২)

ঈশ্বর স্বয়ং যে দেশের রাজা, তিনি যে রাজ্যের সুখ কুশল বর্দ্ধন করিতেছেন, সেই রাজ্যে যাইয়া যদি সেই প্রজাবৎসল রাজাকে দেখিতে চাও, তবে হৃদয়কে পরিবর্ত্তিত কর। কাম, ক্রোধ, লোভ, হিংসা, স্বার্থ, অহঙ্কার বিনাশ করিয়া, অন্তরে ঈশ্বরের পবিত্র রাজসিংহাসনের দিকে ভক্তি, কৃতজ্ঞতা উঠিতে দাও। পবিত্র-হৃদয় ব্রাহ্ম সাধক সেই রাজ্যে যাহা দেখেন, কোটী কোটী মহাকবি তাহা বর্ণনা করিতে পারেন না। ঈশ্বর যেমন সত্যং, তেমনই তিনি সুন্দরং। তিনি যদি সুন্দর হইলেন, তাঁহার রাজ্য কি কুৎসিত হইতে পারে? তাঁহার রাজ্য প্রেমের রাজ্য, সেই রাজ্যে নিত্য মঙ্গল, নিত্য কল্যাণ। সে ঘরে প্রেম, কুশল, আনন্দ, শান্তি সখার ন্যায় একত্র হইয়া বিরাজ করিতেছে। এই সত্য লইয়া যে দিকে যাইবে, সে পথ সুন্দর। এই রাজ্য কোথায়? আমাদের জীবনের শেষে।—(পৃঃ ১৯২)

সাধু অসাধু সকলেই সেই রাজ্যে যাইতে হইবে। কেহবা সবান্ধবে, কেহবা পিতা মাতা এবং বন্ধু বান্ধবহীন হইয়া, দয়াময়,

দয়াময় বলিতে বলিতে পরলোকে চলিয়া যাইবেন। কেহ নির্ভয় হইয়া ঈশ্বরের অভয় নাম উচ্চারণ করিতে করিতে ঈশ্বরের নিকট উপনীত হইবেন, কাহাকেও বা নিতান্ত ক্ষীণ এবং দুর্ব্বল ভাবে ক্রমে ক্রমে শত শত বৎসরে পুণ্য সঞ্চয় করিয়া সেই পুণ্যালয়ে যাইতে হইবে। কিন্তু যে ঘরে ঈশ্বর এবং তাঁহার বৃহৎ পরিবার বাস করেন, সকলকেই একদিন সেই গৃহে প্রবেশ করিতে হইবে। ঐ স্থানই জীবনের লক্ষ্য এবং ঐ গৃহই আমাদের শান্তি-নিকেতন; কিন্তু এই ঘর দূরে না নিকটে? জানিলাম, ইহাই আমাদের গম্যস্থান, কিন্তু ইহা কোথায়, কতদূর? ভ্রাতৃগণ ভগ্নীগণ! ব্রাহ্ম ব্রাহ্মিকা হইয়া যদি বিশ্বাস কর, ঈশ্বরের প্রেম-পরিবারই তোমাদের মুক্তিধাম, পুণ্যরাজ্য, প্রেমরাজ্য, এবং শান্তি-নিকেতন, তবে কখনও এরূপ মনে করিও না যে, ইহা দূরে কিম্বা ইহা বাহিরে। তবে কোথায় এই রাজ্য? ঐ দেখ, ইহা দূরে নহে, বাহিরে নহে, কিন্তু অতি নিকটে, তোমাদের হৃদয় মধ্যে। পবিত্রতা সম্পর্কে ঈশ্বর অতি দূরস্থ হইয়াও দয়াগুণে যেমন তিনি আমাদের অতি নিকটে, সেইরূপ তাঁহার বাসস্থান স্বর্গরাজ্য অতি দূরস্থ হইয়াও আমাদের অতি নিকটে। অন্তরের অন্তরে সেই দূরস্থ স্বর্গরাজ্য। সাধু অসাধু নর নারী সকলেরই হৃদয়ে ঐ রাজ্য বিস্তারিত রহিয়াছে। সাধন-বিহীন ঘোর পাষণ্ড অব্রাহ্ম হৃদয়ের মধ্যেও সেই স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। —(পৃঃ ১৯৩)

শান্তি-নিকেতনের লক্ষণ কি, স্পষ্টরূপে না জানিলে, কল্পনার হস্তে পড়িয়া মরিতে হইবে। পরিত্রাণের জন্য ঈশ্বরকে ঠিক জানা যেমন নিতান্ত প্রয়োজন, তেমনই স্বর্গরাজ্য কি, শান্তি-নিকেতন কি, তাহা জানাও নিতান্ত আবশ্যক। যেখানে সহস্র দুর্দান্ত-হৃদয় অসাধু-প্রকৃতি বিবেকের পদতলে পড়িয়া ঈশ্বরের আদেশ মানিতেছে, ঘোর সংসারীবা

যেখানে বিষয়-লালসা পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্মোপাসনামন্ত্রে দিন দিন দীক্ষিত হইতেছে, পাতকীরা যেখানে পবিত্র হইবার জন্য মহানন্দে ব্রহ্ম-সংকীর্ত্তন করিতেছে, যেখানে বাহিরে মধুর ব্রহ্ম-নামের গভীর রোল উঠিতেছে এবং অন্তরে তদপেক্ষা গভীরতর সুমধুর প্রেমধ্বনি হইতেছে, যেখানে সকলের হৃদয়ে-ঈশ্বরের প্রতি অচলা ভক্তি, পরস্পরের প্রতি নিঃস্বার্থ স্বর্গীয় প্রেম, যেখানে সকলের অন্তরে পুণ্যপ্রভা এবং সকলের মুখশ্রীতে শান্তি-জ্যোৎস্না, যেখানে চারিদিকে স্বর্গের সৌন্দর্য্য, যতই সেই ভক্ত-মণ্ডলীর মধ্যে, তাঁহার সেই পরিবার মধ্যে ঈশ্বরকে দেখি, ততই দেখিতে পাই, তাঁহার মুখের আলোক শান্তি-নিকেতনের প্রত্যেকের উপর পড়িয়াছে।—(পৃঃ ১৯৪)

যে সাধক একবার অন্তরে ঐ প্রেমধাম দেখিয়াছেন, তাঁহার পক্ষে পৃথিবীর দরিদ্রতা, সংসারের দুঃখ কষ্ট কিছুই নহে। একবার বিশ্বাস-চক্ষু খুলিয়া দেখ, পরলোকে সেই ধামে যাইবে। মানস-পথে যে ঐ সুন্দর ছবি দেখিতেছ, সেই ছবি ঐ প্রেমধামের ছবি। ঐ শুন, সেখানে নর নারী সকল দয়াময়, দয়াময়, বলিয়া ডাকিতেছেন। কিবা তাঁহাদের আনন্দ, কেমন তাঁহাদের শোভা! ধন্য হইব, সুখী হইব, যদি সেই নিগূঢ় উচ্চ ব্রহ্মমন্দিরে বাস করিতে পারি। সেখানেই আমাদের পরিত্রাণ, সেখানেই আমাদের শান্তি।—(পৃঃ ১৯৫)

পবিত্রতাশূন্য নর নারী সে রাজ্যে প্রবেশ করিতে পারে না।—(পৃঃ ১৯৫)

* * * * *

এক লক্ষ্য—

পিতার সেই প্রেম-রাজ্যে গমন করাই মনুষ্য-জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য। যিনি যে কোন অবস্থায় থাকুন না কেন, ধনী হউন, মানী

হউন, জ্ঞানী হউন, মূর্খ হউন, সকল অবস্থাতেই এই এক কর্ত্তব্য, এই এক সাধন; পরিশেষে ব্রহ্ম-নিকেতনে, শান্তিধামে, স্বর্গরাজ্যে উপনীত হইতে হইবে। বাহিরের বিভিন্নতা চিরদিন থাকিতে পারে না। আত্মা এক, ঈশ্বর এক, এক শান্তিধামই আত্মার উদ্দেশ্য। আমাদের লক্ষ্য এক, মন্ত্র এক, স্বর্গ এক, অন্তরে বাহিরে গৃহ এক, পরিবার এক, সপরিবারে এক রাজ্যে গিয়া উপনীত হইতে হইবে। একই স্বর্গধামের পথে চলিতে হইবে; ভিন্ন পথে চলিবার উপায় নাই; যিনি চলিবেন, তাঁহাকে ফিরিয়া আসিতে হইবে। এই লক্ষ্য পরিত্যাগ, মনুষ্যত্ব পরিত্যাগ একই। এই পথই মুক্তির পথ। ধন উপার্জ্জন কর, বিদ্যা উপার্জ্জন কর, কিম্বা জ্ঞানই লাভ কর, এই লক্ষ্য স্থির রাখিবে, বামে দক্ষিণে না গিয়া অটল ভাবে সেই দিকে অগ্রসর হও।—(পৃঃ ১৯৬)

একদিকে চক্ষু স্থির রাখিবে, একদিকে নয়ন সংস্থাপিত থাকিবে, যত কথা চিন্তা অবিভক্ত স্রোতে সেই দিকে ধাবিত হইবে। হৃদয় মন আত্মা, যত্ন ও পরিশ্রম, সমুদয়ের সমষ্টি এক লক্ষ্যের সঙ্গে সংযুক্ত করিয়া রাখিবে।—(পৃঃ ১৯৭)

দেখ, স্বর্ণাক্ষরে মনের মধ্যে স্বর্গরাজ্য অঙ্কিত রহিয়াছে। বিচিত্র সুন্দর ব্রহ্মরাজ্য বিশ্বাস-নয়নে সেখানে দেখিতে পাইবে। সেই অনন্ত প্রীতি-ধাম, স্বর্গধামের যিনি রাজা, তাঁহাকে অন্ধকারে অন্বেষণ করিতে হয় না। যিনি বিশ্বপতি হইয়া এই ক্ষুদ্র হৃদয় মধ্যে বাস করিতেছেন, এখানে তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া ভক্তি-করে এমনই তাঁহাকে ধারণ করা যায় যে, প্রাণ শীতল হয়। সহস্র ক্রোশ অন্তরে সেই স্বর্গরাজ্য, অথচ উহা এই ক্ষুদ্র হৃদয়মধ্যে মুদ্রিত রহিয়াছে। অনন্ত ব্রহ্ম, অনন্ত স্বর্গলোক একবার বিশ্বাস-চক্ষে দেখ, দুইই আমাদিগের অন্তরে। ঘরও আমাদিগের অন্তরে, গৃহদেবতাও অন্তরে, রাজাও আমাদিগের

অন্তরে, রাজ্যও অন্তরে, ইহকাল অন্তরে, পরকাল অন্তরে; অন্তরে নিমীলিত-নয়নে দেখ, জাজ্জ্বল্যমান সেই ঈশ্বর-হস্ত-রচিত সুন্দর রাজ্য নয়ন-পথে প্রকাশিত হইবে।—(পৃঃ ১৯৭)

স্বার্থপরতা স্বর্গরাজ্যের পথ নহে। সন্ন্যাসী হইয়া সংসারের সকল বন্ধন ছেদন করিয়া, সেই শান্তিধামে উপনীত হইবার পথ নাই। সংসারত্যাগী সন্ন্যাসীর জন্য স্বর্গধাম নহে। কল্পিত বৈরাগ্যে, স্বার্থপর উপাসনাতে স্বর্গধাম নির্ম্মিত হয় নাই। সমস্ত প্রজামণ্ডলী, সমস্ত নর নারী, সেই গৃহ-দেবতাকে মধ্যে রাখিয়া তাঁহার নাম কীর্ত্তন করিতেছে; সমুদয় স্বার্থ পরিত্যাগ করিয়া এক পরিবার হইয়া অবস্থান করতঃ তাঁহার সেবা করিতেছে; সকলে এক-হৃদয় হইয়া এক পিতার পূজা করিতেছে; এই অবস্থাই ব্রহ্মরাজ্য।—(পৃঃ ১৯৮)

হৃদয়ের মধ্যে ঈশ্বরের গৃহ অন্বেষণ কর।—(পৃঃ ২০০)

* * * * *

লক্ষ্য সাধন—

মনুষ্য-জীবনের সেই একমাত্র লক্ষ্য কি? ঈশ্বরের শান্তিধাম।—(পৃঃ ২০২)

আচার্য্যের উপদেশ—চতুর্থ খণ্ড।

উৎসবের বিরুদ্ধে পাপাচরণ করিও না—

দয়াময় পরমেশ্বরের করুণা প্রকাশ্যভাবে প্রতিদিন যেমন আমাদিগের শরীর-রক্ষার্থে অন্ন জল পান বিধান করিতেছে, তেমনই আধ্যাত্মিক জীবন-রক্ষার্থে ধর্ম্মান্ন বিতরণ করিতেছে।—(পৃঃ ১)

দেখ, ইহলোকে তিনি কত ধন জন সম্পত্তি অর্পণ করিয়াছেন, সুখ বিধান করিতেছেন, আবার স্বর্গলোককে তোমাদের জন্য শান্তিধাম করিয়া রাখিয়াছেন, কত শোভায় শোভিত করিয়া রাখিয়াছেন।—(পৃঃ ৮)

* * * * *

ব্রহ্মরাজ্য—

ব্রহ্মরাজ্য কি সুন্দর রাজ্য! এ রাজ্যের উপরে সংসারের কোন অধিকার নাই। এ রাজ্যে যাঁহারা বাস করেন, সংসার তাঁহাদের সুখ সৌভাগ্য হরণ করিতে পারে না।—(পৃঃ ১১)

এদিকে দেখ, আমাদের ব্রহ্মরাজ্য পর্ব্বতের উচ্চ শিখরে অবস্থিত। নবীন উদ্যান, নূতন স্রোতস্বতী। এ রাজ্যে পার্থিব গোলাপ পুষ্প নাই। এখানে প্রেম-পুষ্প, ভক্তি-চন্দনের অভাব নাই। উৎসাহ-বসন্ত এখানে চিরবিরাজমান। এ পুষ্প কৃত্রিম নহে, এ পুষ্পের নিকট আর সকল পুষ্পই কৃত্রিম, এ চন্দনের সৌরভের নিকট কোথায় অন্য সৌরভ? এ উদ্যানের যিনি প্রভু, তাঁহার দ্বার প্রমুক্ত। অমূল্য রত্নে তিনি তাঁহার গৃহ পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছেন। যে সন্তান সেখানে যায়, রাশি রাশি রত্ন গ্রহণ করে, কেহই বাধা দিতে পারে না। যে ব্যক্তি সেখানে বাস করে, স্বর্গের সুখ লাভ করে।—(পৃঃ ১২)

* * * * *

ব্রাহ্মধর্ম্ম অনাদিকাল সিদ্ধ—

বিশ্বাস ব্রাহ্মগণের প্রাণ। বিশ্বাসবিহীন হইলে তাঁহারা জীবনহীন হয়েন।—(পৃঃ ১৭)

* * * * *

মুঙ্গের ব্রহ্মমন্দির প্রতিষ্ঠা—

মার ক্রোড় হইতে কন্যাগণ যেমন সামগ্রী পাইয়া অঞ্চলে বাঁধিয়া আনন্দে চলিয়া যায়, আমরা তেমনই পিতার হস্ত হইতে শান্তিরস লইয়া আনন্দমনে ঘরে যাইব।—(পৃঃ ২২)

* * * * *

আমি আছি—

বহির্জগতের প্রত্যেক বস্তুর মধ্যে থাকিয়া যেমন ঈশ্বর বলিতেছেন, "আমি আছি", সেইরূপ অন্তর্জগতে থাকিয়া আরও উজ্জ্বলরূপে স্পষ্ট আত্মাদিগের নিকট তাঁহার সত্তা প্রকাশ করিতেছেন। মনের ভিতর গিয়া দেখি, কতকগুলি ফুল ফুটিয়া রহিয়াছে। ভাব-ফুল, প্রেম-ফুল, ভক্তি-ফুল। যেমন বাহিরের বাগানের ফুলে সুন্দররূপে "আমি আছি" এই কথা লিখিয়া রাখিয়াছেন, তেমনই হৃদয়ের এ সকল ফুলে আরও মনোহর, উজ্জ্বল এবং হৃদয়গ্রাহিরূপে তাঁহার নাম লিখিয়া দিয়াছেন।—(পৃঃ ৩৬)

তিনি যখন আমাদিগকে গঠন করিয়া এখানে প্রেরণ করিলেন, তখনই আমাদের প্রত্যেক আত্মাতে "আমি আছি" তাঁহার এই সুমধুর নাম লিখিয়া দিলেন। যতদিন এখানে বাঁচিয়া থাকিব, এবং মৃত্যুকালে ও মৃত্যুর পরেও চিরকাল, অনন্তকাল, এই নাম আমাদের অন্তরে জ্বল জ্বল করিয়া জ্বলিতে থাকিবে। "আমি আছি" অনন্ত জীবন ঈশ্বরের মুখ হইতে এই কথা শুনিতে হইবে।—(পৃঃ ৩৭)

যতই "আমি আছি" পিতার মুখে এই কথা শুনিবে, ততই অন্তরে প্রেমোদয় হইবে এবং ভক্তিভাবে এই কথা শুনিতে শুনিতে আনন্দে পরলোকে চলিয়া যাইবে।—(পৃঃ ৩৮)

* * * * *

ঈশ্বরের সৌন্দর্য্য—

পিতা বড় সুন্দর, একবার তাঁহাকে ভাল করিয়া দেখ, দেখিলেই তিনি নিজে তাঁহার স্বর্গের শোভা দেখাইয়া তোমাদিগকে ভুলাইয়া লইবেন।—(পৃঃ ৪৭)

* * * * *

ব্রাহ্ম পরিবার—

পরস্পরের আকার ভুলিলে মনুষ্য সকলই ভুলিয়া যায়। পৃথিবীতে কি পারিবারিক, কি সামাজিক, রক্ত মাংসের যত সম্পর্ক, সমুদয় সেই আকারগত যোগে নিবদ্ধ রহিয়াছে। মৃত্যুর পর আকার বিলুপ্ত হইলে কিম্বা সেই আকার ভুলিয়া গেলে যে, কাহারও সঙ্গে কোন সম্পর্ক থাকে, সংসারীদিগের জীবন দেখিলে তাহা বোধ হয় না। আকারবিহীন কাহারও সহিত সম্পর্ক থাকিতে পারে, বিষয়ীরা ইহা মনেও ভাবিতে পারে না; যাই আকার বিনষ্ট হইল, সঙ্গে সঙ্গে সম্পর্কও চলিয়া গেল, সংসারের এই রীতি। কিন্তু ব্রাহ্মকে জিজ্ঞাসা কর, তিনি কিরূপে নর নারীর সঙ্গে যোগ স্থাপন করেন। যদি বলেন, এইরূপ সাকার ভাবে, তাহা হইলে তিনি অব্রাহ্ম। ভাই ভগ্নীদের সঙ্গে ব্রাহ্মের যোগ সম্পূর্ণ নিরাকার। তাঁহাদের শরীরের মুখ সুশ্রী হউক আর বিশ্রী হউক, সে দিকে তাঁহার দৃষ্টি নাই, তাঁহার চক্ষু আত্মার উপর। আত্মাতে আত্মাতে তাঁহার নিগূঢ় যোগ। আত্মার আকার নাই, সুতরাং তাহার যোগও কোন প্রকার আকারমূলক নহে।—(পৃঃ ৭৫)

ধূলি-নির্ম্মিত দেহ ঈশ্বরের সন্তান নহে। দেহ যে অনুরাগ লয় তাহা মায়া, তাহা পাপাসক্তি। পৃথিবীর ধূলি-নির্ম্মিত সামান্য চর্ম্মকে আমরা স্বর্গীয় প্রেম দিতে পারি না। পৃথিবীর বস্তু কি স্বর্গীয় প্রেম আকর্ষণ করিতে পারে? তবে প্রেম ভক্তি কে আকর্ষণ করিতে

পারে? ঈশ্বর-নির্ম্মিত সেই স্বর্গীয় বস্তু, নিরাকার কিন্তু প্রেমপুণ্যশীল আত্মা। স্বর্গই স্বর্গকে আকর্ষণ করে। আত্মা আত্মাকে দেখিতে পায়, আত্মা আত্মাকে চিনিয়া লয়, আত্মা আত্মার প্রেমে সম্বদ্ধ হয়, এবং আত্মা আত্মার পুণ্যে সুন্দর হয়। এই নিরাকার আশ্চর্য্য আধ্যাত্মিক যোগ ব্রাহ্মদিগের।—(পৃঃ ৭৬)

যাহাদের সঙ্গে রক্ত মাংসের যোগ, তাহাদিগকে ভালবাসা নিকৃষ্ট; কিন্তু শরীরের সঙ্গে যাহাদের কোন সম্পর্ক নাই, তাহাদিগকে ভাল-বাসাতেই মনুষ্যত্ব, সেই ভালবাসাই চিরস্থায়ী এবং তাহাই ব্রাহ্মের লক্ষ্য।—(পৃঃ ৭৭)

নিরাকার ভাই ভগ্নীদের ভালবাসা এবং প্রাণপণে তাঁহাদের আত্মা পরিপুষ্ট করাই আমাদের জীবনের কার্য্য। পরলোকে কাহারও শরীর সঙ্গে যাইবে না। অতএব ভ্রাতৃগণ, ভগ্নীগণ, যদি ঈশ্বরের হইতে ইচ্ছা কর, যদি মৃত্যুর পরে অনন্ত জীবনের সম্বল চাও, তবে আকারগত সমুদয় শারীরিক সম্পর্ক বিনাশ করিয়া, ঈশ্বরের সন্তান কোথায়, খুঁজিয়া লও। সাকার দেহকে ভাই ভগ্নী বলিয়া আর প্রতারিত হইও না।—(পৃঃ ৭৭)

কিন্তু যিনি যথার্থ ভাই, যিনি যথার্থ বন্ধু, তাঁহার সঙ্গে বিচ্ছেদ নাই; যেখানে যাও, কি দূর দেশে, কি পরকালে, তিনি পিতার চরণতলে বসিয়া আছেন।—(পৃঃ ৭৭)

ধন্য তাঁহারা, যাঁহারা শরীর ভেদ করিয়া আত্মার মধ্যে প্রবেশ করেন, এবং সেখানে প্রেম ভক্তির বস্তু সকল দেখিয়া গোপনে ঈশ্বরের পদতলে প্রেম ও কৃতজ্ঞতার অশ্রু বিসর্জ্জন করেন।—(পৃঃ ৭৮)

শরীরকে ভালবাসে কে? ঈশ্বরের শত্রু। আত্মাকে ভালবাসে কে? ব্রহ্ম-সন্তান।—(পৃঃ ৭৯)

কিন্তু ব্রাহ্ম তিনি, যিনি বাহিরের সমুদয় সৌন্দর্য্য ভুলিয়া গিয়া আত্মার প্রেমে মুগ্ধ হন। ব্রহ্মকে নিরাকার জানিয়া যেমন তাঁহাকে প্রেম করিবে, তেমনই তাঁহার সন্তানদিগকে নিরাকার জানিয়া প্রাণের সহিত তাঁহাদিগকে ভালবাসিবে। ভাই কিম্বা ভগ্নীর মাধুর্য্য সে দিন দেখিব, যে দিন সাধন করিয়া তাঁহাকে মনে হইলেই তাঁহার ভক্তি বিনয় ইত্যাদি কেবল আধ্যাত্মিক পদার্থ সকল মনে হইবে, শরীর মনে থাকিবে না, কেবল তাঁহার মধ্যে যে ব্রহ্ম-সন্তান এবং আমার মধ্যে যে ব্রহ্ম-সন্তান, এই দুইজনের পরস্পর সাক্ষাৎ যোগ এবং দুইজনের মধ্যে পরস্পর সদালাপ হইবে।—(পৃঃ ৭৯)

এই জন্য বলিতেছি, মনুষ্যের শরীর এবং বাহ্যিক আড়ম্বর ভেদ করিয়া ঈশ্বরের পুত্র কন্যার সঙ্গে নিরাকার ভাবে সম্পূর্ণ আধ্যাত্মিক ভাবে সম্মিলিত হও। শরীরের সৌন্দর্য্য ভুলিয়া গিয়া নর নারীর আধ্যাত্মিক প্রেমকে প্রেম কর। তাঁহাদের নিরাকার পবিত্র ভাব গ্রহণ কর; এবং পিতা মাতা, স্ত্রী পুত্র, ভ্রাতা ভগ্নী, বন্ধু বান্ধব সকলের মধ্যে যে ঈশ্বর-সন্তান আছেন, তাঁহাকে দেখিয়া আনন্দে ব্রহ্মরাজ্যে চলিয়া যাও।—(পৃঃ ৭৯)।

পিতা যেমন নিরাকার, তাঁহার পুত্র কন্যারাও নিরাকার।—(পৃঃ ৮০)।

* * * * *

পরিবার কোথায়—

শিষ্য জিজ্ঞাসা করিলেন, পরিবার কোথায়? আচার্য্য বলিলেন, এখানে নহে, ওখানে নহে, তোমার অন্তরে। পুত্র জিজ্ঞাসা করিলেন, পিতা, আমাদের ঘর কোথায়? পিতা বলিলেন, এখানে নয়, ওখানে নয়; কিন্তু তোমার হৃদয়ে।—(পৃঃ ৮০)।

এই ঘর, এই পরিবার উভয়ই আমাদের অন্তরে। অতএব অন্তরে প্রবেশ কর, দেখিবে এক নূতন রাজ্য; সেখানে নিয়ম আছে, শাসন-প্রণালী আছে, রাজা আছেন। রাজা কে? যিনি জগতের নিয়ন্তা, অথচ ইহপরলোকবাসী অগণ্য আত্মাদিগের বিচারপতি।—(পৃঃ ৮১)।

যিনি বলিলেন, স্বর্গরাজ্য অন্তরে, তিনি বলিতেছেন, স্বর্গরাজ্যের প্রজারাও অন্তরে। রাজা, প্রজা ও শাসন-প্রণালী, এ সমস্ত আধ্যাত্মিক, সুতরাং সকলকেই অন্তরে খুঁজিতে হইবে।—(পৃঃ ৮১)।

যে পরিমাণে ব্রহ্ম-প্রজাদিগের সঙ্গে প্রাণের যোগ, অন্তরের যোগ, সে পরিমাণে ব্রাহ্মের শ্রেষ্ঠতা এবং আধ্যাত্মিক উন্নতি।—(পৃঃ ৮২)।

কিন্তু নিশ্চয়ই এমন দিন আসিবে, যখন এক একটী আত্মার মধ্যে সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরের রাজ্য এবং তাঁহার বিস্তীর্ণ পরিবার সংগঠিত হইবে।—(পৃঃ ৮৩)।

বাহিরের চক্ষে অস্থায়ী বাহ্যিক বস্তু প্রতিবিম্বিত হয়; কিন্তু ভিতরের নয়নে চিরস্থায়ী আত্মার সৌন্দর্য্য, আত্মার প্রেম, পুণ্য এবং আত্মার জ্ঞানজ্যোতি প্রতিভাত হয়। ভক্তের উজ্জ্বল আন্তরিক চক্ষু শরীর ভেদ করিয়া আত্মাকে দর্শন করে, এবং যে আত্মার যেরূপ অবস্থা এবং স্বভাব, তাঁহাদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ঠিক সেইরূপ প্রকাশিত হয়। এইরূপে সহজেই ঈশ্বরের ব্রহ্মরাজ্য ভক্তের হৃদয়ে মুদ্রিত হয়।—(পৃঃ ৮৪)

যখন আত্মায় আত্মায় যোগ হইবে, তখন কথা বলিবার প্রয়োজন থাকিবে না, আপনা আপনি পরস্পরের ভাব পরস্পরের মধ্যে প্রবেশ করিবে। সেই অবস্থায় দুই চক্ষু পরস্পরকে দেখিল, অমনই স্বর্গ রাজ্যের সেই উচ্চ পবিত্র মোহ আসিয়া পরস্পরকে আকৃষ্ট করিল।

কোন কথা বলিলেন না, অথচ অবাক্ হইয়াও ভাবের দ্বারা পরস্পরের সঙ্গে কথা কহিলেন। দর্শনেই শ্রবণ হইল। পরস্পরের চক্ষে এমন কি দেখিলেন, যাহা আত্মাকে একেবারে মুগ্ধ করিয়া ফেলিল? সেই স্বর্গরাজ্যের সংবাদ পত্র। ভক্তের নয়নে সেই স্বর্গীয় প্রেম জ্বলিতেছে। যাহারা এই প্রেমপ্রভা না দেখিয়া কেবল নর নারীর চক্ষু দেখিয়া ভোলে, তাহারা পশু। এইরূপে যখন আত্মার মিলন হয়, তখন কথা বলিবার প্রয়োজন হয় না, দেখিবামাত্র আত্মা আত্মাকে চিনিয়া লয়। ইহা অপেক্ষা উচ্চতর অবস্থায় পরস্পরকে দেখিবারও প্রয়োজন হয় না, তখন সম্পূর্ণ আধ্যাত্মিকভাবে আত্মায় আত্মায় মিলন হয়। সেই অবস্থায় আমার বন্ধু কি ইংলণ্ডে, কি পরলোকে, যেখানেই কেন থাকুন না, আমাদের মধ্যে চুল মাত্র বিচ্ছেদ থাকিবে না, কেন না আত্মা ইহলোকে যাহা, পরলোকেও তাহা।—(পৃঃ ৮৫)

আত্মায় আত্মায় কোন শারীরিক ব্যবধান নাই। প্রেমেই আত্মার যোগ, প্রেমের অভাবেই আত্মার বিচ্ছিন্ন অবস্থা, সুতরাং যতদিন প্রেম থাকিবে, ততদিন বন্ধুর লোকান্তরেও যোগের কোন পরিবর্ত্তন নাই।—(পৃঃ ৮৬)।

ঈশ্বরের আধ্যাত্মিক রাজ্যে কাহারও মৃত্যু নাই। ইহলোকে থাকিয়া ভক্তগণ পরলোকবাসীদের সাহায্য লাভ করেন।—(পৃঃ ৮৮)

*   *   *   *   *

ব্রহ্মে বাস, ভাই ভগ্নীতে একত্ব—

আত্মার যেমন বিনাশ নাই, আত্মায় আত্মায় যে সম্বন্ধ, তাহারও অন্ত নাই।—(পৃঃ ৯০)।

শান্তিজল কি? ব্রহ্ম। পাপতাপে দগ্ধ ব্যক্তি যখন সেই ব্রহ্মরূপ-সাগরে প্রবেশ করে, তখন সহজেই তাহার সমস্ত আত্মাতে সেই

নির্ম্মল শান্তিবারি সঞ্চারিত হয়। অতএব, ব্রাহ্মগণ, যদি শান্তি চাও, তবে কেবল ঈশ্বরের নিকটবর্ত্তী হইয়া থাকিও না, তাঁহার মধ্যে প্রবেশ কর। ঈশ্বর-সহবাসী নয়, কিন্তু ঈশ্বরবাসী হইতে হইবে।—(পৃঃ ৯৪)।

আত্মার একটু সামান্য সৌন্দর্য্য দেখিলেই মন মোহিত হয়। আবার যখন ভাবি, ঈশ্বর-কৃপায় সেই আত্মা অনন্তকাল জীবিত থাকিবে, এবং তাহার রূপলাবণ্য ও গুণরাশি অনন্তকাল বৃদ্ধি হইবে, তখন দেখি, আত্মায় আত্মায় যে প্রেম, তাহাও অনন্তকাল স্থায়ী। —(পৃঃ ৯৬)।

* * * * *

পরিবার (১)—

ঈশ্বর ভিন্ন দুটী মনুষ্যাত্মার পরস্পর মিলন অসম্ভব। যেমন একটা বিশেষ বস্তু আঠা মধ্যে রাখিবামাত্র দুটী প্রস্তর কিম্বা দুখানি ইষ্টক সংলগ্ন হয়, এবং সেই মধ্যস্থ বস্তু বিনষ্ট হইলেই দুখানা আবার দুদিকে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে, সেইরূপ দুটী আত্মার মধ্যে যদি ঈশ্বর মধ্যস্থ না হন, কদাচ তাহাদের মধ্যে পবিত্র যোগ হইতে পারে না।—(পৃঃ ১০১)

পিতার করুণা ভিন্ন কখনই একটা আত্মা আর একটা আত্মার নিকটতর হইতে পারে না।—(পৃঃ ১০১)।

* * * * *

পরিবার (২)—

শরীরের আকার এবং রূপ যেমন ভিন্ন ভিন্ন, তেমনই লোকের বুদ্ধিও ভিন্ন ভিন্ন থাকিবে। দেহ মনের বিভিন্নতা কখনও আধ্যাত্মিক যোগের প্রতিবন্ধক নহে। এক প্রকার রূপ কিম্বা এক প্রকার

মত, এ সকল সামান্য নীচ ভূমির উপর আধ্যাত্মিক যোগ, স্থাপিত হয় না। সেই ভূমি অতি উচ্চ এবং অপরিবর্ত্তনীয়, যাহার উপর আত্মায় আত্মায় যোগ হয়। সেই ভূমি ছাড়িলে অন্য স্থানে যোগের বৃক্ষ জন্মে না। যে ভূমির যে বৃক্ষ, সে ভূমিতে সেই বৃক্ষ রোপিত হইলেই তাহা সারবান হইয়া ক্রমে ক্রমে ফল ফুলে সুশোভিত হয়। যে ক্ষেত্রতত্ত্ব জানে, সেই জানে, কোন্ ভূমি কোন্ বৃক্ষের উপযোগী। গাছ হইলেই হয় না, কিন্তু উপযুক্ত ভূমিতে রোপণ করিলেই তাহা সফল হয়।—(পৃঃ ১১০)।

এক ঈশ্বর আমাদের সকলের পিতা, এবং তাঁহার সঙ্গে এই সম্পর্ক চিরকাল থাকিবে। শরীর পড়িয়া থাকিবে শ্মশানে; কিন্তু আত্মা চিরকাল ঈশ্বরেতে বাঁচিয়া থাকিবে এবং তাঁহাকে পিতা বলিয়া ডাকিবে। এই সংসারের যাহা কিছু দেহ কিম্বা মনের দ্বারা গ্রহণ করি, সকলই পড়িয়া থাকিবে; কিন্তু পিতার সঙ্গে যে আমার প্রাণের যোগ, তাহার কিছু মাত্র হ্রাস হইবে না।—(পৃঃ ১১৩)।

*   *   *   *   *

স্বর্গরাজ্য—

বিশ্বাস-নয়ন খুলিলে প্রতিজন দেখিতে পাইবেন, বহুদূরে সুন্দর স্বর্গরাজ্য প্রসারিত রহিয়াছে। সেখানে সমুদয় মনুষ্যজাতি সুখ শান্তি এবং স্বর্গীয় সৌন্দর্য্যে সুশোভিত।—(পৃঃ ১২৪)।

এই পৃথিবীর মধ্যে রাখিয়াই তিনি আমাদিগকে স্বর্গের জন্য প্রস্তুত করিতেছেন।— পৃঃ ১২৫)।

এক দিকের স্বর্গরাজ্য অর্থাৎ পরলোকের স্বর্গ সম্পূর্ণরূপে নিরাকার এবং অদৃশ্য, আর এক দিকের অর্থাৎ এই পৃথিবীর স্বর্গ যদিও আপাততঃ সাকার, কিন্তু গূঢ়রূপে দেখিলে ইহাও নিরাকার। এই

দু'দিক হইতেই শৃঙ্খল আসিয়া আমাদিগকে আকর্ষণ করিতেছে।—(পৃঃ ১২৫)।

ভবিষ্যতে ঈশ্বর আছেন, মৃত্যুর পরেও পরলোকে তিনি আমাদিগকে রক্ষা করিবেন, এই বিশ্বাস থাকিলেই মৃত্যুর সময় আনন্দমনে এই পৃথিবী পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার নিকট চলিয়া যাইতে পারি।—(পৃঃ ১২৫)।

প্রত্যেকের অন্তরে তিনি স্বর্গরাজ্যের আদর্শ রাখিয়া দিয়াছেন, কেন না তিনি জানেন, ইহা ভিন্ন মনুষ্যসন্তান কখনই স্বর্গরাজ্য নির্ম্মাণ করিতে পারে না।—(পৃঃ ১২৯)।

অতএব কেহই নিরাশ হইও না, ঈশ্বর তাঁহার প্রত্যেক পুত্র কন্যার জন্য একটী সুন্দর গৃহ নির্ম্মাণ করিতেছেন, সেই গৃহে বসিয়া চিরদিন আমরা তাঁহার সৌন্দর্য্য দেখিব, এবং তাঁহার অগণ্য সন্তানদিগের সঙ্গে সম্মিলিত হইব।—(পৃঃ ১৩২)।

* * * * *

স্বর্গরাজ্যে বিশ্বাস—

অন্তরের স্বর্গরাজ্য আগে, বাহিরের স্বর্গরাজ্য পরে, যখন ঈশ্বরের স্বর্গরাজ্য ভক্তের আত্মাতে উজ্জ্বলরূপে প্রকাশিত হয়, তখন আপনা আপনি তাহা যথাসময়ে বাহ্যিকরূপে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত হয়।—(পৃঃ ১৩৫)।

গর্ভস্থ সন্তান যখন সম্পূর্ণাবয়ব লাভ করে, তখন আর ইহা সেই অন্ধকারময় জরায়ু মধ্যে থাকিতে পারে না; দশমাস যে পৃথিবীর জন্য প্রস্তুত হইতেছিল, যাই তাহার সমুদয় অঙ্গ পূর্ণ হইল, তখনই সে পৃথিবীতে আসিয়া প্রকাশিত হইল। সেই শিশুকে দেখিয়া সকলের হৃদয় উল্লাসে পূর্ণ হইল। সেইরূপ যখন ভক্ত-হৃদয়ে স্বর্গরাজ্যের

ছবি সম্পূর্ণরূপে চিত্রিত হয়, যথাসময়ে তাহা আপনি পৃথিবীতে প্রকাশিত হইয়া পড়ে। অতএব বন্ধুগণ, তোমাদের আত্মাতে সেই শান্তি-নিকেতনের বীজ অঙ্কুরিত হইতে দাও, তাহা হইতে যথা-সময়ে নিশ্চয়ই স্বর্গরাজ্য প্রসূত হইবে।—(পৃঃ ১৩৫)।

মৃত্যুর পর স্বর্গে যাওয়া দূরের কথা, কিন্তু ব্রাহ্মধর্ম্মের গুণে ইহ-লোকে থাকিয়াই আমরা স্বর্গ ভোগ করিব।—(পৃঃ ১৪১)।

* * * * *

অমরত্ব লাভের স্থান—

মনুষ্যের মনকে যদি একটী প্রশস্ত রাজ্যের সঙ্গে তুলনা করা যায়, তবে বলিতে হইবে, সে রাজ্যের প্রত্যেক বিভাগ মৃত্যুর অধীন। মনের মধ্যে কোন স্থানে সংশয়, কোন স্থানে বিশ্বাস, কোন স্থানে পাপ, কোন স্থানে পুণ্য, কোন স্থানে নরক, কোন স্থানে অশান্তি, কোন স্থানে শান্তি, ইত্যাদি নানা প্রকার ভাব এবং অভাব রহিয়াছে; কিন্তু বাহিরে যেমন সকলের উপরেই মৃত্যুর আধিপত্য, কি সুস্থ, কি জীর্ণ শীর্ণ, কি ধনী, কি দরিদ্র, কি মূর্খ, কি পণ্ডিত, কি ধার্ম্মিক, কি অসাধু, কেহই মৃত্যুকে অতিক্রম করিতে পারে না, মনের বিবিধ বিভাগ সম্পর্কেও সেইরূপ। কাহারও প্রতি পক্ষপাতী হওয়া মৃত্যুর স্বভাব নয়, দেখ মৃত্যু সকলকেই গ্রাস করিতেছে। ইহার স্পর্শে কল্য যাহা ছিল, অদ্য তাহা নাই। মন সম্পর্কেও সেইরূপ।—(পৃঃ ১৯০)

জগতের ইতিহাস পাঠ কর, নিজের জীবন দেখ, দেখিবে, সর্ব্বত্র মৃত্যুর অধিকার; কিন্তু প্রতিজনের আত্মার মধ্যে একটী স্থান আছে, যেখানে মৃত্যু যাইতে পারে না, সেই স্থান অমর; মৃত্যু বরং মরিতে পারে, কিন্তু মনের সেই বিভাগ কখনই মরে না। ঈশ্বর স্বয়ং তাহা

অমর করিয়া সৃষ্টি করিলেন। তাহা কি, কেহ বলিতে পারে না; কিন্তু সেই স্থানে আসিবার জন্য মনুষ্য-স্বভাব সর্ব্বদা ব্যস্ত।—(পৃঃ ১৯১)

*　　*　　*　　*　　*

অভ্যাসই শত্রু, অভ্যাসই মিত্র—

ঈশ্বরের নিয়ম অখণ্ড এবং অপরিবর্ত্তনীয়। যেমন জড় জগতে, সেইরূপ আমাদের মনোরাজ্যে, তাঁহার নিয়ম অলঙ্ঘনীয়।—(পৃঃ ২০৩)

যেমন ছায়া অপেক্ষা বস্তুর এবং অসত্য অপেক্ষা সত্যের বল অধিক, সেইরূপ পাপ অপেক্ষা পুণ্যের বল অধিক। কেননা পাপে মৃত্যু এবং পুণ্যেতেই আত্মার যথার্থ জীবন।—(পৃঃ ২০৪)

আচার্য্যের উপদেশ—পঞ্চম খণ্ড।

স্বর্গ—

স্বর্গ কি? যেখানে ঈশ্বর তাঁহার ভক্ত সন্তানদিগকে লইয়া বাস করেন, তাহাই স্বর্গ, ইহা ভিন্ন স্বর্গ আর কিছুই নহে। যেখানে ঈশ্বরের সন্তানগণ তাঁহার উপাসনা এবং তাঁহার নাম গান করিয়া পরিত্রাণ লাভ করেন, তাহাই স্বর্গ। যেখানে ঈশ্বর স্বয়ং মধ্যস্থলে থাকিয়া তাঁহার পুত্রে পুত্রে, কন্যাতে কন্যাতে, এবং পুত্র কন্যাতে পবিত্র প্রেমযোগে পরস্পরকে সম্বদ্ধ করেন, যেখানে জীবাত্মা পরমাত্মাকে পাইয়া সংসারের সমুদয় পাপ তাপ ভুলিয়া যায়, যেখানে মহাপাতকীর হৃদয় হইতে ঈশ্বরের প্রতি প্রেম, ভক্তি এবং কৃতজ্ঞতা উত্থিত হয়, যেখানে মনুষ্যের স্বার্থপরতা উদার প্রেমসিন্ধু মধ্যে এবং তাহার রিপু সকল জ্বলন্ত পুণ্যের মধ্যে বিলীন হইয়া যায়, যেখানে কোটী কোটী মনুষ্য ঈশ্বর-প্রেমে এক হইয়া যায়, তাহাই স্বর্গ।—(পৃঃ ৩)

স্বর্গে একদিকে যেমন ঈশ্বরের সঙ্গে মনুষ্যের অনন্তকালের গূঢ়তম প্রেমযোগ, অপরদিকে তাঁহার সন্তানদিগের মধ্যে চিরকালের জন্য অখণ্ড প্রেমযোগ। যেখানে যথার্থ স্বর্গের মিলন, সেখানে দ্বিবচন কিম্বা বহুবচন নাই। সেখানে সকল নরনারী এক-প্রাণ, একাত্মা ; জাতি-ভেদ, বর্ণভেদ সেখানে স্থান পাইতে পারে না।—(পৃঃ ৪)

রূপ, গুণ, ধন, মান, জ্ঞান, ধর্ম্ম কিম্বা জাতিভেদ, কিছুতেই স্বর্গীয় বন্ধন শিথিল করিতে পারে না। সেখানে সকলেই একপ্রাণ, একাত্মা; ইহাই স্বর্গের প্রধান লক্ষণ।—(পৃঃ ৫)

সেখানে শোক, তাপ এবং হৃদয়ভার নাই। যাহারা স্বর্গের বাহিরে, তাহারাই মলিন-হৃদয়, কিন্তু যাঁহারা স্বর্গের মধ্যে, তাঁহারা চির-প্রফুল্ল। সেখানে সর্ব্বদাই আনন্দ-স্রোত, পুণ্য-স্রোত প্রবাহিত হইতেছে ; নিরানন্দ, অপবিত্রতা সেখানে প্রবেশ করিতে পারে না। —(পৃঃ ৬)

স্বর্গে আংশিক প্রেম, আংশিক শান্তি নাই, সেখানকার সকলই সম্পূর্ণ।—(পৃঃ ৬)

*　　*　　*　　*　　*

ঈশ্বর অতি নিকটে—

ধন্য তিনি, যিনি জীবন মৃত্যু, সম্পদ বিপদ, এবং সজন নির্জনে পিতার মুখে এই কথা শুনেন, "এই আমি"। এই যে সুলভ ব্রহ্মধন, ইহা আমাদের প্রতিজনের নিকটে।—(পৃঃ ১৩)

তিনি আমার নিকটতম বন্ধু এবং প্রাণের সহিত গ্রথিত, ইহা উপলব্ধি করিলে কি আর অন্তরে বিষাদ নিরানন্দ থাকিতে পারে ?— (পৃঃ ১৪)

কাহারও দূরে যাইতে হইবে না, নিকটে ঈশ্বর-দর্শন পাইয়া শান্তি সুখ লাভ করিবে।—(পৃঃ ১৪)

ভাই ভগ্নী—

কিন্তু ঈশ্বরের আদেশে ইনি ঈশ্বরের পুত্র, ইনি ঈশ্বরের কন্যা, ইহা স্পষ্ট বুঝিয়া যখন কোন আত্মাকে আমার ভাই ভগ্নী বলিয়া আত্মার আসনে বরণ করি, তাহা চিরকালের জন্য এবং সেই সম্পর্কই যথার্থ স্বর্গীয় এবং পারলৌকিক।—(পৃঃ ১৬)

* * * *

দীক্ষিতদিগের প্রতি উপদেশ—

তাঁহাকে গুরু বলিয়া ধারণ কর; জ্ঞান, প্রেম, পুণ্য, শান্তি, যাহা চাও, সকলই তাঁহার কাছে পাইবে।—(পৃঃ ২০)

* * * * *

আত্ম-পরিচয়ে ব্রহ্ম-পরিচয়—

ভক্তেরা চিরকাল বলিয়া আসিতেছেন, মনুষ্যের মধ্যে আত্মা বলিয়া যে পুরুষ আছে, যিনি সেই পুরুষকে চিনিয়াছেন, তিনি নিত্য সুখের আধার পরম পুরুষকে দেখিয়াছেন; কেননা সেই পুরুষের সঙ্গে পরম পুরুষের নিগূঢ় প্রত্যক্ষ যোগ।—(পৃঃ ৪২)

যাঁহার চক্ষু একবার সেই স্বর্গের শোভা দেখিয়াছে, আর তিনি তাহা ভুলিতে পারেন না।—(পৃঃ ৪৮)

অতএব বন্ধুগণ, আর বাহিরে যাইও না, আত্মার মধ্যে প্রবেশ কর, আত্মারূপ শাস্ত্র পাঠ কর, আত্মারূপ আন্তরিক পথে চলিতে থাক,

এবং আত্মারূপ খনি খনন কর, আপনি আপনার রূপ দেখিয়া মুগ্ধ হইবে, আপনি আপনার ধনে ধনী হইবে। সুখ বল, শান্তি বল, নিত্য ধন বল, বাহিরে অন্বেষণ করিতে হইবে না, আপনার মধ্যে সকলই দেখিবে।—(পৃঃ ৪৪)

*　　*　　*　　*　　*

জীবন্ত সাধন—

ধর্ম্মরাজ্যে এমন একটি উচ্চ স্থান আছে, যাহা অধিকার করিলেই সাধকের সঙ্গে ব্রহ্মের প্রত্যক্ষ যোগ হয় এবং উপাসনা তখন স্বভাবতঃই সরস হয়।—(পৃঃ ৫২)

যাঁহারা দেহত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহাদের কাহারও মৃত্যু হয় নাই। তাঁহারা সকলেই সেই জীবনের জীবন ঈশ্বরের ক্রোড়ে বাঁচিয়া আছেন। কোথায় কি অবস্থায় রহিয়াছেন, তাহা আমরা জানি না, সে বিষয় ঈশ্বর আমাদিগকে জানিতে দেন নাই; কিন্তু এই জন্য আমরা ঈশ্বরকে ধন্যবাদ করি যে, তিনি আমাদের অন্তরে এই জ্ঞান দিয়াছেন যে, ইহলোকে আমি যাঁহার কাছে বাঁচিয়া আছি, পরলোকে আমার সমুদয় বন্ধুরা তাঁহারই কাছে বাঁচিয়া আছেন। এই জ্ঞানে আমাদের কত আনন্দ হয়, ইহলোকে আমরা যে ঈশ্বরকে ডাকিতেছি, তিনিই পরলোকবাসী সকলের ঈশ্বর। সকলেই এক ঈশ্বরের কাছে উপস্থিত রহিয়াছে, সুতরাং ইহ পরলোক দুইই আমার কাছে। ইহাই পরলোক সম্পর্কে জীবন্ত সাধন। যম নামে কোন জীব নাই, মৃত্যু বলে কিছুই নাই, এ ব্যক্তি মৃত, ইহার অর্থ নাই, কেননা দুইই জীবিত। আত্মার পক্ষে কেবল পাপই মৃত্যু।—(পৃঃ ৫৪)

ঈশ্বরতত্ত্ব, পরলোকতত্ত্ব এবং নীতিতত্ত্ব, জীবন্ত ভাবে তোমরা এই তিনটী সাধন কর। দেখিবে, অচিরে তোমাদের মধ্যে ঈশ্বরের পবিত্র

রাজ্য সংস্থাপিত হইবে, এবং যে জন্য আমরা বাড়ী হইতে আসিয়াছি, তাহা সুসম্পন্ন হইবে।—(পৃঃ ৫৬)

*　　*　　*　　*　　*

ঈশ্বর আমাদের সহায়—

বিপদ্‌কালে, "হে দয়াময়, কোথায় রহিলে, হে দয়াময়, কোথায় রহিলে" বলিয়া চীৎকার করিয়া ডাক; দেখিবে, ডাকিতে না ডাকিতে সেই বিপদ্‌ভঞ্জন পিতা আসিয়া তোমাদের সহায়তা করিবেন।—(পৃঃ ৫৮)

নির্জ্জন গহন বনে একাকী ভ্রমণ করিতে করিতে কোন বন্ধুকে লাভ করিলে যেমন মনুষ্য নির্ভয় হয়, সেইরূপ এই সংসার-পথে যিনি সেই ভয়বারণ ঈশ্বরকে লাভ করেন, তাঁহার আর আপদের ভয় থাকে না।—(পৃঃ ৫৮)

ঈশ্বর আমাদের সহায়, ইহা শুনিলে কাহার মন না প্রফুল্ল হয়? দেশ বিদেশে তিনি ভিন্ন আর উপায় নাই। দীনবন্ধু বলিয়া কাতর প্রাণে তাঁহাকে ডাক, অন্তরের দুঃখ পাপ আপনি দূর হইবে।—(পৃঃ ৫৮)

তাঁহারই গুণ গান কর, প্রচুর সুখ শান্তি পাইবে, আর দুঃখ ভয় থাকিবে না; সমুদয় কষ্ট যন্ত্রণা অতিক্রম করিয়া সেই শান্তি-নিকেতনে পিত্রালয়ে প্রবেশ করিতে পারিবে।—(পৃঃ ৫৯)

তিনি হস্ত ধরিয়া তোমাদিগকে সেই গৃহে লইয়া যাইবেন, যেখানে নিত্য পুণ্যের প্রবাহ প্রবাহিত হয়, এবং যেখানে ভক্তের হৃদয় নিত্য স্বর্গের আনন্দ-জ্যোৎস্নায় পুলকিত হয়।—(পৃঃ ৫৯)

*　　*　　*　　*　　*

নৈকট্য সাধন—পরলোক—

ঈশ্বরকে যেমন ভক্ত নিকটে উপলব্ধি করেন, সেইরূপ পরলোকও ভক্তের অতি নিকটে। অবিশ্বাসীর নিকট পরলোক অতি দূরে এবং অন্ধকারময়, অজানিত স্থান; কিন্তু ভক্ত পরলোকবাসী লোকদিগের সহিত একত্রে বাস করিতেছেন। কেননা তিনি জানেন, যেখানে ঈশ্বর, সেখানেই পরলোক। ঈশ্বর নিকটে, সুতরাং পরলোকবাসী আত্মা সকলও নিকটে। পৃথিবীতে যে সকল মহাত্মা আমাদের উপকার করিয়া গিয়াছেন, পরলোকেও তাঁহারা আমাদের মঙ্গল সাধন করিতেছেন, ভক্ত ইহা স্পষ্টরূপে অনুভব করেন।—(পৃঃ ৬১)

সর্ব্বাগ্রে ঈশ্বরকে কাতর প্রাণে ডাক, তিনি পরলোক এবং স্বর্গ তোমাদের নিকটে আনিয়া দিবেন।—(পৃঃ ৬২)

* * * * *

নিরাকার ঈশ্বর-দর্শন—

সুখ এ পৃথিবীতে নাই, অসার বিষয়-সুখে জীবের তৃপ্তি হয় না, প্রকৃত ঈশ্বরকে না জানিলে আত্মার শান্তি নাই।—(পৃঃ ৭৫)

অমৃত-পাত্র হাতে লইয়া হৃদয়ের মধ্যে তিনি দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন; দগ্ধ মনের উপর প্রেমের শীতল জল বর্ষণ করিবেন, এই তাঁহার সঙ্কল্প।—(পৃঃ ৭৬)

* * * * *

দীক্ষিতগণের প্রতি উপদেশ—

যখনই তাঁহাকে ডাকিবে, তখনই তিনি দেখা দিয়া তোমাদের আত্মাতে প্রেমামৃত বর্ষণ করিবেন, এবং মাতার ন্যায় পুণ্য-সুধা পান করাইবেন।—(পৃঃ ৮৩)

* * * * *

সশরীরে স্বর্গে গমন—

যতদিন দেহ লইয়া আমরা স্বর্গে প্রবেশ করিতে না পারিব, ততদিন কোন মতেই আমাদের দুঃখ পাপ দূর হইবার নহে।—(পৃঃ ৮৮)

শরীর থাকিতেই আমরা স্বর্গে যাইব, ইহা পরমেশ্বরের ইচ্ছা, স্বর্গে যাইবার জন্য আমাদিগকে মৃত্যুর প্রতীক্ষা করিতে হয় না; কিন্তু দেহ নাশ হইবার পূর্ব্বে এই পৃথিবীতে থাকিতেই আমরা স্বর্গের সুখ ভোগ করিব, ইহা আমাদের স্বর্গীয় পিতার অভিপ্রায়।—(পৃঃ ৮৮)

সশরীরে স্বর্গে যাওয়া, ইহার অর্থ কি? ইহা নহে যে, শরীর ব্রহ্ম-ভক্ত হইয়া স্বর্গের সুখে মুগ্ধ হইবে; কিন্তু ইহার অর্থ এই যে, শরীরের মধ্যে যে আত্মা আছে, শরীর থাকিতে থাকিতেই সেই আত্মা সন্ন্যাসী হইয়া ঈশ্বরের প্রেমে উন্মত্ত থাকিবে। পৃথিবীর শরীর পৃথিবীতেই থাকিবে; কিন্তু আত্মা সংসারের সুখে উদাসীন হইয়া স্বর্গে বাস করিবে এবং ঈশ্বরের আনন্দে পুলকিত থাকিবে।—(পৃঃ ৮৯)

ঈশ্বরের প্রকৃত ভক্ত জানেন যে, স্বর্গে যাইবার জন্য শরীরকে বিনাশ করিতে হয় না, এবং কিছু মাত্র ইহার বিষয় চিন্তা করিবারও প্রয়োজন নাই, ইহার নিঃশ্বাস রুদ্ধ করিতে হয় না, অথবা ইহার রক্ত-স্রোত থামাইতে হয় না; কেননা শরীর আত্মার দাস, আত্মা ঈশ্বরের সন্নিধানে উপস্থিত হইলে, শরীর কিছুমাত্র বাধা দিতে পারে না। মৃত্যুকে ডাকিয়া বলিতে হয় না, আমার শরীর বিনাশ কর। নতুবা শরীর থাকিতে আমার আধ্যাত্মিক জীবনের অভ্যুদয় হয় না।—(পৃঃ ৯১)

* * * * *

সপরিবারে স্বর্গে গমন—

যেখানে সাধক বিশ্বাস এবং বিনয়ের উচ্চ শিখরে বসিয়া ঈশ্বরের চরণ ধারণ করেন, যেখানে সাধকের প্রেম জলস্রোতের ন্যায় প্রবাহিত

হইয়া নিত্য ঈশ্বরের শ্রীচরণ ধৌত করে, যেখানে ভক্তি কৃতজ্ঞতার সৌরভে আত্মা নিত্য আমোদিত হয়, এবং সহজেই সাধকের মন ঈশ্বরের নাম গানে উন্মত্ত হয়, সেখানেই আমাদের দয়াময় পিতার স্বর্গ। যেখানে প্রকৃত বিশ্বাস এবং গভীর জ্ঞান ঈশ্বরের জ্বলন্ত সত্তা এবং অনন্ত মহিমা আবিষ্কার করে, যেখানে প্রেম এবং ভক্তি দয়াময় ঈশ্বরকে অতি নিকটে উপলব্ধি করে, যেখানে ভক্ত অনুগত সেবকের ন্যায় প্রভু পরমেশ্বরের আজ্ঞা পালন করেন, সেখানেই আমাদের যথার্থ স্বর্গ। অতএব কেহই বহির্বিষয়ে স্বর্গ অন্বেষণ করিও না; কিন্তু সকলেই হৃদয়ের পথে অগ্রসর হও, অচিরে স্বর্গ লাভ করিয়া সুখী হইবে।—(পৃঃ ৯৩)

বহির্জগতে যে সৌন্দর্য্য, তাহার কবি অনেক, কিন্তু আত্মার মধ্যে যে পরম সুন্দর প্রেমময়ের রাজ্য, তাহার কবি নাই।—(পৃঃ ৯৪)

বল, এই যে হৃদয়ের মধ্যে ঈশ্বরের রাজ্য, ইহাই আমাদের স্বর্গ। ইহকাল, পরকাল, অনন্তকাল আমরা এই স্বর্গেই বাস করিব, অন্য স্বর্গ আমরা চাহি না।—(পৃঃ ৯৪)

সেই ভিতরের স্বর্গ-রাজ্যে লইয়া যাইবার জন্য প্রতিদিন ঈশ্বরের রথ আসিতেছে, যদি একাকী যাইতে চাও, সেই রথ ফিরিয়া যাইবে; কিন্তু যদি সবান্ধবে, সপরিবারে যাইতে প্রস্তুত হও, তবে সেই স্বর্গের রথ তোমাদিগকে সশরীরে স্বর্গে লইয়া যাইবে।—(পৃঃ ১০০)

*   *   *   *   *

স্বর্গ-প্রাপ্তি—

স্বর্গ-প্রাপ্তির জন্য পৃথিবী পরিত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে যাইতে হয়, ইহা আমরা মানি না। কোন বিশেষ স্থানে আমাদের স্বর্গ আছে, তাহা আমরা বিশ্বাস করি না, স্থান পরিবর্ত্তনে কাহারও স্বর্গ-লাভ

হয় না; কিন্তু হৃদয়ের ভাব-পরিবর্ত্তনেই যথার্থ স্বর্গ-লাভ হয়।—(পৃঃ ১০২)

স্বর্গ-প্রাপ্তি কি? পৃথিবীর আসক্তি পরিত্যাগ করিয়া ঈশ্বরের সহিত যোগ সংস্থাপন করা। যে অবস্থায় পৃথিবীর মধ্যে অবস্থান করিয়াও আত্মা ঈশ্বরে বাস করে, তাহাই স্বর্গ, এবং তাহাই আমাদের দেবত্ব।—(পৃঃ ১০২)

*   *   *   *   *

ভাই ভগিনী অন্তরে—

ঈশ্বরের সঙ্গে যেমন প্রতি আত্মার এরূপ নিগূঢ় এবং নিত্য প্রাণ-যোগ, ভাই ভগ্নীর সঙ্গেও মনুষ্যের সেইরূপ আধ্যাত্মিক এবং চিরস্থায়ী সম্পর্ক; এই যোগ ভুলিয়া যাহারা বাহিরে ভাই ভগ্নী অন্বেষণ করে, তাহাদিগকে একদিন নিশ্চয়ই নিরাশ হইয়া ফিরিয়া আসিতে হয়। ভাই ভগ্নীরাও বাহিরে নহেন; কিন্তু অন্তরে।—(পৃঃ ১১৯)

*   *   *   *   *

দীক্ষিতদিগের প্রতি উপদেশ—

ব্রাহ্ম হইয়াছ কেন, তাহা কি বুঝিতে পারিতেছ না? সুখধামে লইয়া যাইবেন, এই জন্য ঈশ্বর তোমাদিগকে ডাকিয়াছেন; ঐ দেখ পথ শেষ হইয়া আসিতেছে, নিকটে কেমন সুন্দর একটী নিকেতন দেখা যাইতেছে, সেথানে প্রেম ভক্তি পুষ্প সকল ফুটিয়াছে, সমস্ত গৃহ গন্ধে আমোদিত। ভ্রাতৃগণ! এ ঘর ঈশ্বর তোমাদের জন্য নির্ম্মাণ করিতেছেন; এ ঘরে গিয়া ভাই ভগ্নীদিগকে দেখিলেই পরিত্রাণ। ইহারই নাম শান্তি-নিকেতন, এখানে আসিলে মহাপাপী পবিত্র হয়, নিঃসম্বল সম্বল লাভ করে।—(পৃঃ ১৪৪)

*   *   *   *   *

কূপ ও নদী—

শান্তিবারির প্রয়োজন নাই, এমন লোক নাই।—(পৃঃ ১৬২)

অতল-স্পর্শ অগাধ শান্তিবারি মস্তকের উপর দিয়া চলিয়া যাইতেছে, অন্য বিষয় কিরূপে দেখিব? চারিদিকেই ঈশ্বরের পাদপদ্ম হইতে প্রেমজল, ভক্তিজল, সুখজল, শান্তিজল বহিতেছে।—(পৃঃ ১৬৪)

* * * * *

দেব-প্রকৃতি—

কিন্তু বাহিরে যে পরিমাণে চক্ষু অশ্রুপাত করিবে, আত্মার গভীরতম স্থানে তাঁহারা সেই পরিমাণে স্বর্গের প্রফুল্লতা লাভ করিবেন।—(পৃঃ ১৮১)

আত্মার গভীরতম স্থানে স্বর্গরাজ্য।—(পৃঃ ১৮২)

* * * * *

স্বর্গীয় সম্বন্ধের সৌন্দর্য্য—

প্রত্যেক মনুষ্য তাঁহার পুত্র, কিম্বা কন্যা। তিনি জানেন, জগদ্বাসী প্রত্যেকের সঙ্গে তাঁহার এই একটী সম্বন্ধ আছে, যাহা চিরস্থায়ী, মৃত্যু যাহা বিনাশ করিতে পারে না, এবং পাপ, পুণ্য, অথবা অন্য কোন পরিবর্ত্তনেও যাহার বিনাশ নাই।—(পৃঃ ২০০)

* * * * *

আশা-শাস্ত্র—

যাঁহারা কেবল এই দেখেন, রাত্রির পর দিন আসিবেই, দুঃখের পর সুখ আসিবেই, বিপদের পর সম্পদ আসিবেই, কোন পরিবর্ত্তনেই তাঁহাদের মৃত্যু নাই।—(পৃঃ ২১৫)

* * * * *

চির উন্নতি—

শরীরের যেমন বৃদ্ধি হয়, আত্মারও সেইরূপ উন্নতি হয়। ভৌতিক নিয়মে শরীরের বৃদ্ধি, মানসিক নিয়মে আত্মার উন্নতি। শরীরের বৃদ্ধির সীমা আছে; কিন্তু আত্মার উন্নতির সীমা নাই।—(পৃঃ ২৩৬)

* * * * *

উপাসনাতে সুখ—

উপাসনাই আমাদের পথ এবং উপাসনাই আমাদের গম্যস্থান। উপাসনাই আমাদের উপায়, এবং উপাসনাই আমাদের উদ্দেশ্য। ঈশ্বরের প্রেমরাজ্যে যাইতে হইলে উপাসনা ভিন্ন আর অন্য পথ নাই। ইহা যেমন পথ, ইহাই আবার গম্যস্থান।—(পৃঃ ২৪২)

ঈশ্বর এত দয়া করিয়া আমাদিগকে কেবল তাঁহার সেই দূরস্থ পবিত্র গৃহে যাইতে আদেশ করিয়া নিশ্চিন্ত হন নাই, কিন্তু নিজে সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া, আমাদের পথের কষ্ট দূর করিবার জন্য পথের ধারে ধারে প্রচুর অন্ন, এবং তাঁহার শীতল প্রেমবারিপূর্ণ সরোবর খনন করিয়া রাখিয়াছেন।—(পৃঃ ২৪৪)

উপাসনাতে যতদিন সুখী হইব, ততদিন কোন বিপদ পরীক্ষা ভয় দেখাইতে পারে না। ধন্য ঈশ্বর যে, তিনি উপাসনার মধ্য দিয়া আমাদের অন্তরে স্বর্গের মিষ্টতা ঢালিয়া দেন!—(পৃঃ ২৪৪)

* * * * *

অনন্তকাল-সাগর—

সেই অনন্তকাল যাহা ভাবিলে হৃদয় কম্পিত এবং প্রাণ স্তব্ধ হয়, ঈশ্বরের কৃপায় বিশ্বাসীদিগের নিকটে তাহা আনন্দের ব্যাপার।—(পৃঃ ২৫৪)

আমাদের স্বর্গ-রাজ্য সেই মহাকাল-সাগরে ভাসিতেছে।—(পৃঃ ২৫৫)

ভাই ভগ্নীদের সঙ্গে একবার সেই অনন্তকালের প্রেম-শৃঙ্খলে বদ্ধ হইলে আর বিচ্ছেদ হইতে পারে না। সেখানে পরিবর্ত্তন নাই। প্রাতঃকাল, সায়ংকাল, মাস, বৎসর, শতাব্দী সেখানে নাই, এক অনন্তকাল সেখানে ধূ ধূ করিতেছে। আমাদের স্বর্গরাজ্য সেই অসীম সাগরে ভাসিতেছে। যদি আমরা তাহার মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিতাম, তাহা হইলে সেই পরলোকবাসী এবং এই পৃথিবীর সমুদয় ঈশ্বর-পরায়ণ আত্মাদিগের সঙ্গে আমরা এক-হৃদয় হইয়া সেই মহাসাগরে ভাসিতাম।—(পৃঃ ২৫৬)

* * * * *

নির্লিপ্ত ঈশ্বর—

জগতে বাস করিতে হইবে; কেন না ইহা আমাদের বিদ্যালয়। এই বিদ্যালয়ে নানাবিধ পরীক্ষায় সংশোধিত এবং উত্তীর্ণ হইয়া আমাদিগকে ঈশ্বরের অমৃতরাজ্যে যাইতে হইবে। আমরা পৃথিবীর নানাপ্রকার ঘটনার মধ্যে পড়িয়া পরীক্ষিত এবং উন্নত হইব, এইজন্য আমাদের গুরু পথের মধ্যে এই বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন। এখানে সহস্র বিঘ্ন বিপদ এবং সহস্র প্রকার নিরাশা মৃত্যুর সঙ্গে সম্মুখ সংগ্রাম করিতে হইবে। শত শত প্রলোভনের মধ্যে বাস করিতে হইবে, অথচ কিছুতেই আত্মা মুগ্ধ এবং মৃতপ্রায় হইবে না। সম্পদ বিপদ, সুখ দুঃখ, রোগ শোক ইত্যাদি সমুদয় ঘটনার মধ্যে ঈশ্বর যাহা শিক্ষা দেন, বিনীতভাবে তাহা শিক্ষা করিতে হইবে।—(পৃঃ ২৭২)

যে মৃত্যু ব্রহ্মাণ্ডকে চূর্ণ করে, ঈশ্বরের শরণাগত ব্যক্তির উপর সেই মৃত্যুর কোন হস্ত নাই।—(পৃঃ ২৭৪)

ঈশ্বরের আশ্রিত ব্যক্তির মৃত্যু নাই; কেবল তাঁহাকে বিশ্বাস করিতে হইবে যে, আমি ঈশ্বরের আশ্রিত। যিনি ইহা বিশ্বাস করেন, পাপী হইয়াও তিনি অভয় পদ লাভ করিয়াছেন।—(পৃঃ ২৭৫)

প্রত্যেক বিপদ গুরু হইয়া আমাদিগকে শিক্ষা দান করিয়া চলিয়া যাইবে।—(পৃঃ ২৭৬)

যেমন পঙ্ক হইতে পদ্ম সকল প্রস্ফুটিত হয়, সেইরূপ ঈশ্বরের কৃপায় এই পৃথিবীর পাপ হইতে পুণ্য, দুঃখ হইতে সুখ, নিরাশা হইতে আশা উৎপন্ন হয়।—(পৃঃ ২৭৬)

*　*　*　*　*

প্রার্থনার উত্তর অবশ্যম্ভাবী—

প্রার্থনারূপ পরলোকের সম্বল হস্তে লইয়া, আনন্দের সহিত শান্তি-ধামে চলিয়া যাইবে।—(পৃঃ ২৮০)

*　*　*　*　*

পাপের অন্ত আছে, পুণ্যের অন্ত নাই—

আশ্রিত ব্যক্তির উপর মৃত্যুর কিছুমাত্র অধিকার নাই, ব্রাহ্মধর্ম্মের এই প্রথম আশার কথা।—(পৃঃ ২৮১)

যেখান হইতে যাহা আসে, সেখানে তাহা যাইবেই যাইবে। ঈশ্বর হইতে যাহা নিঃসৃত হয়, তাহা যাঁহার চরণে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, অনন্ত-কাল তাঁহারই দিকে যাইবে। এইজন্য সকল সাধুভাব ঈশ্বরের দিকে যাইবেই।—(পৃঃ ২৮৪)

অনন্তকাল মনুষ্য হাসিবে, অনন্তকাল মনুষ্য প্রফুল্ল হইবে, এই জন্য তিনি তাহাকে সৃজন করিয়াছেন। দয়াময় ঈশ্বরের রাজ্যে অশান্তির দিকে নিশ্চয় সীমা আছে; কিন্তু শান্তির দিকে অন্ত নাই।—(পৃঃ ২৮৪)

ব্রাহ্মের সমক্ষে স্বর্গ হাসিতে লাগিল। স্বর্গ আপনার আকর্ষণ প্রকাশ করিতে লাগিল। স্বর্গ বলিল, আমারই রাজ্য চিরদিনের জন্য। —(পৃঃ ২৮৭)

সুখী, পুণ্যবান্ হইব অনন্তকালের জন্য ; অসুখী হইব কিয়ৎক্ষণের জন্য। চিরকাল ঈশ্বরের ক্রোড়ে বসিয়া হাসিব।—(পৃঃ ২৮৭)

আচার্য্যের উপদেশ—ষষ্ঠ খণ্ড।

সম্মুখে আলোকময় ভবিষ্যৎ—

বন্ধুগণ, তোমরা সকলেই অমরত্ব যে দিকে, সেই পথে অগ্রসর হও। আশার শাস্ত্র যদি অধ্যয়ন করিতে চাও, তবে পশ্চাৎ দেখিও না ; কিন্তু সম্মুখে তোমাদের জন্য ঈশ্বর কেমন সুন্দর ভবিষ্যৎ রাখিয়াছেন, তাহা দেখ।—(পৃঃ ৩)

ভবিষ্যতে অমৃতের সাগর, শান্তির অগাধ মহাসমুদ্র। বড় দুঃখ পাইয়াছ, পথিক, ইহা মানিলাম ; কিন্তু যখন ঐ সম্মুখের সুন্দর ঘরে প্রবেশ করিবে, তখন কত সুখী হইবে, একবার ভাবিয়া দেখ। যখন সেই ঘরে ভক্তেরা আসিয়া হাত ধরিয়া তোমাকে পিতার কাছে লইয়া যাইবেন, তখনকার আনন্দ একবার বিশ্বাস এবং আশা-নয়নে দর্শন কর। আমাদের ভূতকাল যত কেন দুঃখময় হউক না, আমাদের ভয় নাই, কেন না আমাদের ভবিষ্যৎ শান্তিতে পরিপূর্ণ হইয়া আমাদের জন্য প্রতীক্ষা করিতেছে।—(পৃঃ ৬)

* * * * *

ব্রহ্মদর্শনে ব্রাহ্মত্ব—

যে চক্ষে ব্রহ্মদর্শন হয়, তাহা আকার দেখিতে পায় না।—(পৃঃ ৭)

*   *   *   *   *

প্রাণ-দুর্গ—

যদি হৃদয়ের মধ্যে যথার্থ বিশ্বাস থাকে, বিপদে ঈশ্বরের সঙ্গে বিশ্বাসীর যোগ গূঢ়তর এবং ঘনিষ্ঠতর হয়।—(পৃঃ ১২)

বিঘ্ন বিপদ আছে বলিয়াই ঈশ্বরের অভয় পদের এত আদর।—(পৃঃ ১৩)

চিরদিন যন্ত্রণার অনলে প্রাণ দগ্ধ হইতেছিল, কিন্তু ব্রহ্ম-সহবাসে প্রাণ শীতল হইয়াছে।—(পৃঃ ১৩)

বিপদ বন্ধু হইয়া আমাদিগকে ঈশ্বরের অব্যবহিত সন্নিধানে লইয়া যাইতেছে; অতএব যিনি বিপদকে ঈশ্বরের রাজ্য হইতে বাহির করিয়া দেন, তিনি ধর্ম্ম-জগতের অর্দ্ধেক বিশ্বাস করেন, পূর্ণ বিশ্বাস তাঁহার হয় নাই।—(পৃঃ ১৩)

জল ত সর্ব্বদাই দেখি; কিন্তু তৃষ্ণার পর যে জল পান করি, তখন জলের কত সৌন্দর্য্য। সেইরূপ আত্মার তৃষ্ণার পর যখন তাঁহার চরণারবিন্দের শান্তিবারি পান করি, তখনই বুঝিতে পারি, ব্রহ্মকৃপা কত মধুর। দুঃখের পর ঈশ্বর-দর্শন অতি অপূর্ব্ব।—(পৃঃ ১৪)

বিপদ-কণ্টক স্বর্গ হইতে অমৃত লইয়া উপস্থিত হয়।—(পৃঃ ১৫)

*   *   *   *   *

প্রেমের জয়—

যদি ঈশ্বরের কথা শুনিতে পাই, তবে ঘোরতর পরীক্ষার অগ্নিও আমাদিগকে দগ্ধ করিতে পারে না।—(পৃঃ ২১)।

নিত্যধামে চল, যেথানে অভয়দাতা ঈশ্বরকে লাভ করিয়া, আমরা সকলে ভয় মৃত্যুর হস্ত হইতে রক্ষা পাইব।—(পৃঃ ২৭)

* * * * *

বৈরাগীর গৃহ—

স্বর্গের নিত্যধামে এবার ভাইদের সঙ্গে আলাপ করিয়া বহুকালের মনের দুঃখ দূর করিব। বন্ধুদিগকে ঈশ্বরের আরামপূর্ণ গৃহে দেখিয়া আনন্দিত হইব। সেই গৃহে স্বয়ং ঈশ্বর ভাণ্ডারী হইয়া রত্ন সকল বাহির করিয়া দিতেছেন।—(পৃঃ ৩৪)

* * * * *

ঈশ্বর-দর্শন—

যতই তাঁহার দর্শনে আত্মার ভাব মধুর হইবে, ততই তোমরা উন্নত হইবে।—(পৃঃ ৪০)

যখন আর সকলেই পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়, তখনও তিনিই অন্তরে দেখা দেন; ঘোর বিপদ এবং দুঃখ শোকের নদীর ভিতর দিয়াও তাঁহারই দর্শন।—(পৃঃ ৪০)

তিনি তাঁহার নিরাকার সৌন্দর্য্য দ্বারা জীবাত্মাকে পুলকিত করেন। যদিও তিনি গুণ-বিশিষ্ট নিরাকার আত্মা, তথাপি তাঁহার দর্শনে মুগ্ধ ভাব হয়। যেথানে আকর্ষণ করিবার শক্তি আছে, সেথানে রূপের প্রয়োজন কি? ঈশ্বর আমাদিগকে তাঁহার সৌন্দর্য্য দ্বারা আকর্ষণ করেন।—(পৃঃ ৪২)

* * * * *

নিঃসন্দিগ্ধ ব্রহ্ম-দর্শন—

যেমন পরস্পরের দর্শনে মোহিত হই, তেমনই যথার্থ ঈশ্বর-দর্শনে জীবাত্মা মোহিত হয়।—(পৃঃ ৪৫)

* * * * *

ব্রহ্মবাণী—

যাঁহারা ঈশ্বরের নিকটে আছেন, তাঁহারা স্বর্গের কথা সকল সুস্পষ্টরূপে শুনিতে পান। যতই আমরা স্বর্গের নিকটস্থ হই, ততই স্বর্গের কথা সকল সুস্পষ্টরূপে আমাদের হৃদয় অধিকার করে।—(পৃঃ ৬৬)

তিনি চিরকালই তাঁহার সন্তানদিগকে "আশা কর, উৎসাহ কর" কথা সকল বলিয়া আসিতেছেন।—(পৃঃ ৬৯)

*   *   *   *   *

ধর্ম্মজীবন কি ?—

ঈশ্বর আমাদের জন্য বাহিরের কাগজে শাস্ত্র লেখেন নাই ; কিন্তু অন্তরের অন্তরে তিনি আমাদের সঙ্গে কথা কন ; যদি সেই স্বর্গের কথা শুনিয়া জীবন পবিত্র করিতে চাও, এবং সকল সংশয় দূর করিতে ইচ্ছা কর, তবে সেই হৃদয়ের ঘরে প্রবেশ করিয়া ঈশ্বরের সঙ্গে সদালাপ কর, সমুদয় বিবাদের মীমাংসা হইবে।—(পৃঃ ৭৩)

*   *   *   *   *

সংসার-বিদ্যালয়—

যাহা চিরকাল থাকিবে না, তাহার উপর হৃদয়ের সমুদয় অনুরাগ স্থাপন করাই অসারতা।—(পৃঃ ৭৭)

প্রত্যেকেরই বৈরাগ্যের প্রয়োজন। সেই বৈরাগ্যের সূত্রপাত হইল কোথায়? মৃত্যু-ঘটনায়। সুতরাং মৃত্যু আমাদের গুরু। মৃত্যু পৃথিবীর সমুদয় অসারতা এবং অনিত্যতা স্পষ্টাক্ষরে দেখাইয়া দিল।—(পৃঃ ৮০)

*   *   *   *   *

দীনবন্ধু—

সংসারের কষ্ট যন্ত্রণায় যখন ভয়ানকরূপে হৃদয় বিদীর্ণ হইয়াছে, তখন সেই অন্তরের অন্তরে, একজনকে দেখিয়াছি বলিয়া এখনও বাঁচিয়া আছি, এবং তাহাই এ প্রাণ-ধারণের একমাত্র হেতু বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছি।—(পৃঃ ৯২)

একবার কেবল তাঁহার কাছে পঁহুছিতে পারিলেই হইল, যিনি আপনাকে দীনের সখা বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। দর্শনে শ্রবণে সমুদয় দুঃখ নিরানন্দ চলিয়া যাইবে।—(পৃঃ ৯৫)

* * * * *

ঈশ্বর ভিখারী—

যে দুঃখ কাঁদায়, সেই দুঃখই প্রাণেশ্বরকে নিকটে আনিয়া দেয়। যে দুঃখ শত্রু হইল, সেই দুঃখই মিত্র হইল। যে চক্ষু কাঁদিয়াছিল, সেই চক্ষুই হাসিল।—(পৃঃ ১১৬)

* * * * *

প্রমত্ত অবস্থা—

বিচ্ছেদ হয় হউক, বিচ্ছেদের পর মিলন মিষ্টতর হইবে।—(পৃঃ ১৩০)

* * * * *

জগজ্জননীকে দেখা—

এক একদিন যখন আমাদের বুক দুঃখে বিদ্ধ হইয়া অবসন্ন হইয়া পড়ে, তখন কাহার মুখ দেখিতে যাই? যিনি দুঃখীদের ক্রন্দন শুনেন, তাঁহারই চরণ আমাদের একমাত্র আরাম-স্থল। যদি দুঃখ

দূর করিতে চাও, ইঁহাকে যত্ন করিয়া রাখিও, ভালবাসার আসনে ইঁহাকে রাখিও।—(পৃঃ ১৩৮)

*　　*　　*　　*　　*

ব্রহ্মস্পর্শ (১)—

কেমন পুণ্যপ্রদ, কেমন সুমধুর সেই স্পর্শ! হস্ত নাই, অঙ্গুলি নাই, অথচ স্পর্শ হইল। যখন এই সুখ, এই পুণ্য বুঝিতে পারিবে, তখন দেখিবে, তোমার আশাক্ষেত্র আরও বিস্তৃত হইল। কেন না তখন জানিবে, পরমাত্মাকে কেবল দেখা যায়, শুনা যায়, তাহা নহে, কিন্তু তাঁহাকে জীবাত্মা স্পর্শ করিতে পারে।—(পৃঃ ১৫২)

*　　*　　*　　*　　*

ব্রহ্মস্পর্শ (২)—

যদি দর্শন শ্রবণ আত্মার মধ্যে হইতে পারে, তবে স্পর্শও হইতে পারে।—(পৃঃ ১৫৩)

স্পর্শেতে একদিকে যেমন যুক্তি ও প্রমাণ প্রবল হয়, আর এক দিকে তেমনই আত্মার শান্তি ও আনন্দ বৃদ্ধি হয়। আত্মার গভীরতম স্থানে আত্মার কর সকল প্রসারিত হইল, আর ব্রহ্ম-সহবাস অনুভূত হইল। যাঁহার আত্মার হস্ত ভগ্ন, অথবা স্পর্শ-শক্তি দুর্ব্বল, তিনি কিরূপে ঈশ্বরের স্পর্শ-সুখাস্বাদ করিবেন? কিন্তু যাঁহার আত্মার শক্তি সকল সতেজ, যাঁহার চক্ষু বলে, ঐ দেখ তোমার সম্মুখে কে, কর্ণ বলে, ঐ শুন কে কথা বলিতেছেন, স্পর্শ বলে, এই দেখ কে তোমাকে স্পর্শ করিতেছেন, তিনি বলেন, জগতে এমন কে আছে যে, এমন পবিত্র সুখ হইতে আমাকে বঞ্চিত করিতে পারে? যখন জীবাত্মা এই প্রকার প্রগাঢ় ভাবে পরমাত্মাকে ধারণ করে, তখন আত্মার আশ্চর্য্য ব্যাপার সকল শরীরের মধ্যেও প্রকাশিত হয়।—(পৃঃ ১৫৪)

আত্মা যদি স্বর্গবাসী হয়, শরীরও স্বর্গবাসী হয়।—(পৃঃ ১৫৫)

*　　*　　*　　*　　*

দুই শ্রেণীর বিশ্বাসী—

এই কথা যেন পিতাকে বলিতে পারি, দুঃখ দাও, কষ্ট দাও, ক্ষতি নাই ; কিন্তু অভয় দিও, তাহা হইলেই সুখী হইব।—(পৃঃ ১৬০)

*　　*　　*　　*　　*

ব্রহ্মস্পর্শ (৩)—

সাধক যতই শীতল জল চান, ঈশ্বর ততই তাহা দেন।—(পৃঃ ১৬৭)

*　　*　　*　　*　　*

ত্রিবিধ যোগ—

শরীরের চক্ষু যেমন বাহিরের সৌন্দর্য্য দেখিতে চায়, আত্মাও সেইরূপ স্বর্গের সুন্দর বস্তু সকল দেখিতে বাঞ্ছা করে, এবং শরীরের কর্ণ ও হস্ত যেমন সুস্বর শুনিবার জন্য ও সুকোমল বস্তু ধরিবার জন্য সচেষ্ট হয়, আত্মার বিবেক-কর্ণ ও ভক্তি-হস্তও সেইরূপ ঈশ্বরের অমৃত-ময় বাক্য শ্রবণ ও তাঁহার পবিত্র শ্রীচরণ ধারণ করিতে ব্যাকুল হয়।—(পৃঃ ১৬৯)

আত্মার কর্ণও যাই একবার স্বর্গের সুস্বর শুনিল, অমনই সেই দিকে আকৃষ্ট হইয়া রহিল, আর ফিরিল না। সেখানে কেমন মধুময় সদুপদেশ সকল শুনিতে লাগিল। একটীর পর একটী সুমিষ্ট কথা কর্ণে প্রবিষ্ট হইতে লাগিল। শুনিল, সেখানে পৃথিবীর পক্ষিগণ হইতে আরও সুমিষ্টস্বরে কে গান করিতেছে। সেখানে সাধক একটু যদি সময় নষ্ট করেন, স্বর্গের কথা শুনিতে পান না, এবং তখনই

তাঁহার অন্তরে বিষময় দুঃখ হয়, এইজন্য সর্ব্বদাই তিনি ভিতরের কর্ণ জাগ্রত রাখেন। এইরূপে যতই দিন রাত্রি ক্রমাগত তিনি স্বর্গের সুমিষ্ট উপদেশ সকল শ্রবণ করেন, ততই অভ্যাস দ্বারা স্বর্গের শব্দের সঙ্গে সাধকের কর্ণের বন্ধন দৃঢ়তর হয়।—(পৃঃ ১৬৯)

ফলতঃ গভীররূপে স্বর্গের শোভা দেখিলে এবং স্বর্গের কথা শুনিলে আর চক্ষু কর্ণ ফিরে না। সেইরূপ ঈশ্বরের পবিত্র শীতল চরণে একবার প্রণাম করিয়া আশীর্ব্বাদ লাভ করিলে চিরকাল সেই চরণের আশ্রয় ভিন্ন আত্মা বাঁচিতে পারে না।—(পৃঃ ১৭০)

* * * * *

সুখের বৈরাগ্য—

ঈশ্বরের বিশ্বাসী সন্তানের কিছুতেই ভয় নাই, কিছুরই অভাব নাই। অভাব-রাশির মধ্যে তিনি সুখী, ঘোর বিপদে আক্রান্ত হইলেও তিনি নির্ভয়, কেন না তিনি ভবকাণ্ডারীকে সহায় করিয়াছেন।—(পৃঃ ২০৯)

যেখানে অন্তরে আনন্দচন্দ্রের জ্যোৎস্না, সেখানে বাহ্যিক অন্ধকারে কি করিবে ?—(পৃঃ ২১৫)

* * * * *

ব্রহ্ম-দর্শনের উপায়—

তোমাদিগের সম্বন্ধে ব্রহ্মদর্শন ইহ পরকালের সম্বল।—(পৃঃ ২২২)

* * * * *

পরলোকজাত বৈরাগ্য—

প্রকৃষ্ট বৈরাগ্য পারলৌকিক সামগ্রী, ইহলোকের নহে। উহার মূল ও ফল পারলৌকিক।—(পৃঃ ২৩৭)

ইহলোক এবং শ্মশানের অতীত ভূমি পরলোক।—(পৃঃ ২৩৮)

সংসারে থাকিয়া ইন্দ্রিয়-দমন চেষ্টা কর, মৃত্যু-চিন্তা করিও না। —(পৃঃ ২৩৮)

সর্ব্বদা সেই পরলোক লাভের জন্য লালায়িত এবং যত্নবান্ থাক। (পৃঃ ২৩৮)

পরলোকবাসীর নিকটে সকলই সার, অসার বলিয়া বিশেষণ নাই। যত সামগ্রী দর্শন স্পর্শন শ্রবণ করেন, সে সকলই সার—চিরকাল স্থায়ী।—(পৃঃ ২৪১)

ইহলোককে পদাঘাত করিয়া, শ্মশানকে অতিক্রম করিয়া, আত্মা উড্ডীন হইয়া পরলোক প্রাপ্ত হয়।—(পৃঃ ২৪২)

ব্রহ্ম আছেন যেমন প্রমাণ করিতে হয় না, পরলোক আছে এ কথাও তেমনই প্রমাণ করিতে হয় না। ঈশ্বর আছেন, পরলোক আছে, মানিতে হইবে। মৃত্যু নামে অবরোধক কোন প্রাচীর নাই। এই জীবনই প্রসারিত হইতেছে, বিস্তৃত হইতেছে, উহা ইহলোক নহে, পরলোক নহে, একই লোক।—(পৃঃ ২৪৩)

* * * * *

দ্বিজত্ব—নবশিশু—

পিতা মাতার সঙ্গে পুত্র কন্যার সাদৃশ্য পার্থিব, ঈশ্বরের সঙ্গে নিরাকার আত্মার সাদৃশ্য স্বর্গীয়।—(পৃঃ ২৯০)

আত্মাতে ঈশ্বরের মুখশ্রী প্রতিবিম্বিত হইয়া সেই বর্ণের জ্যোতি বাহিরের মুখ শোভিত করে।—(পৃঃ ২৯০)

* * * * *

উপাসনা—

বিপদ যাহার কাছে সম্পদ, মৃত্যু-বিভীষিকা তাহার কি করিতে পারে?—(পৃঃ ৩১৭)

আচার্য্যের উপদেশ—সপ্তম খণ্ড।

প্রেম-পিঞ্জর—

দয়াময় একটী পরম সুন্দর উদ্যান স্বর্গধামে নির্ম্মাণ করিয়াছেন, সংসার-জঙ্গলের পাখীগুলি ধরিয়া খাঁচায় রাখিয়া কিছুদিন শিক্ষা দিয়া তাহাদিগকে সেই উদ্যানে ছাড়িয়া দিবেন। সেই উদ্যান লতা পল্লবে কেমন শোভিত! কত অমৃত-বৃক্ষ, কত প্রেম-সরোবর, কত সুন্দর ফুল, কত সুমিষ্ট ফল; তথায় উড়িয়া বেড়াইতে কত আনন্দ হইবে!—(পৃঃ ৯)

ধর্ম্মরাজ্যের যত উচ্চ স্থানে যাওয়া যায়, ততই সুখ শান্তি।—(পৃঃ ১২)

*　　*　　*　　*　　*

ধ্যানের উদ্বোধন—

প্রাণের সমুদয় দুঃখ দূর হইবে, যদি রস-সাগরে ডুবিতে থাকি।—(পৃঃ ১৩)

হৃদয়ের অভ্যন্তরে অন্তরাত্মার প্রসন্ন মুখ দেখিয়া যখন আত্মার চক্ষু বিমোহিত হয়, এবং তাঁহার সেই মুখের রসামৃত পান করিয়া যখন আত্মার কর্ণ সুশীতল হয়, তখন মনুষ্য বলে, যখন এমন রূপ, এমন সুধা ঘরে পাইলাম, তখন আর বাহিরে যাইব কেন?—(পৃঃ ১৩)

*　　*　　*　　*　　*

দুঃখ না হইলে জীবন হয় না—

আলোকের সময়, সুখের সময় যে সকল বস্তু উপস্থিত হয়, সে সকল যেমন সাধক ভক্তি এবং কৃতজ্ঞতার সহিত গ্রহণ করেন, ঘোর বিপদ অন্ধকারের মধ্যে ঈশ্বরের আজ্ঞাতে যে সকল কষ্টকর ঘটনা সমাগত হয়, সে সমুদয়ও সাধক সেই এক মঙ্গলকর হস্ত হইতে আসিতেছে বিশ্বাস করিয়া, তাহাদিগকে চুম্বন করেন। দুঃখ মনুষ্যের উপকার করে।—(পৃঃ ৩১)

অতএব স্বর্ণকে নির্ম্মল করিবার জন্য যেমন অগ্নি চাই, তেমনই চিত্ত শুদ্ধ করিবার জন্য দুঃখ চাই।—(পৃঃ ৩১)

* * * * *

দানে ধন-বৃদ্ধি—

যত ঈশ্বরের তত্ত্ব আলোচনা করিবে, ঈশ্বরের প্রসঙ্গ করিবে, তত পরলোকের সম্বল হইবে।—(পৃঃ ৪৪)

* * * * *

পানে তৃষ্ণা-বৃদ্ধি—

ব্রহ্ম-দর্শনের গভীরতা না হইলে দুঃখ বিষণ্ণতা ঘুচিবে না।—(পৃঃ ৪৬)

* * * * *

চিত্ত-তীর্থ—

যথার্থ তীর্থে গমন করিলে আত্মার মধ্যে প্রবেশ করিতে হইবে। তীর্থ বাহিরে নহে, তীর্থ অন্তরে, তীর্থ দূরে নহে, অত্যন্ত নিকটে।—(পৃঃ ৯৩)

* * * * *

ঈশ্বর স্বপ্রকাশ, না অপ্রকাশ—

আজ যেমন ব্রহ্ম-দর্শন পাইলাম, ক্রমাগত ইহা অপেক্ষা উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর দর্শন পাইব। ইহলোকে এইরূপ চলিল, পরলোকেও এইরূপ চলিবে। গভীর আনন্দের পর গভীরতর আনন্দ। উজ্জ্বল দর্শনের পর উজ্জ্বলতর দর্শন।—(পৃঃ ৯৮)

* * * * *

ভিতরে স্থিতি—

পরলোকের সম্বল নিজের হৃদয়ের মধ্যে করিব। প্রকৃত উন্নতি ভিতরের দিকে। প্রকৃত শ্রদ্ধা বিশ্বাস ভিতরে। এক দিকে যেমন মন উচ্চ হইতে উচ্চতর আকাশে যাইবে, অন্যদিকে তেমনই অন্তর হইতে অন্তরতর স্থানে যাইবে।—(পৃঃ ১৩১)

ভিতরে বাড়ী আছে, বন্ধু সহায় আছেন, প্রেমোদ্যান আছে।—(পৃঃ ১৩২)

* * * * *

শরীরের বার্দ্ধক্য, আত্মার শৈশব।

আত্মা শরীরের ধর্ম্ম স্বীকার করে না। শরীরের বয়স যে পরিমাণে বৃদ্ধ হইবে, আত্মা সেই পরিমাণে দিন দিন শিশু হইবে।—(পৃঃ ১৫৯)

* * * * *

অশ্রুজলের মাহাত্ম্য—

জল বিনা সংসার চলে না, সেইরূপ ধর্ম্মরাজ্যেও হৃদয় শুষ্ক হইলে আর আশা থাকে না।—(পৃঃ ১৭০)

কিন্তু বাস্তবিক আকাশ হইতে বারি-বর্ষণ না হইলে যেমন শস্যাদি

জন্মে না এবং সংসার চলে না, সেইরূপ চক্ষু হইতে বারি-বর্ষণ না হইলে ধর্ম্ম-জীবন হইতে পারে না।—(পৃঃ ১৭০)

প্রত্যক্ষরূপে তাঁহাকে দেখিলে যে নয়ন-বারি পতিত হয়, তাহাতে হৃদয় শীতল হয়।—(পৃঃ ১৭৩)

*

আহ্লাদপূর্ণ আকাশ—

ঈশ্বরকে কেবল প্রেমময় বলিয়া জানিলে সকল সন্তাপ যাবে না। দুঃখী তাঁহার আনন্দ-মুখ দর্শন করিতে চায়। ভয়ানক দুঃখ বিপদের মধ্যে একবার বন্ধুর পানে তাকাইলাম, তিনি আমার প্রতি দৃষ্টি করিয়া একবার হাসিলেন, আর ঐ হাসির মধ্যে সুখের শাস্ত্র, পরিত্রাণের শাস্ত্র পাইলাম।—(পৃঃ ১৮৫)

একবার আনন্দময়ের প্রতি তাকাও, যখনই একবার তিনি সহাস্য-বদনে তোমার প্রতি দৃষ্টিপাত করিবেন, তোমার সকল সন্তাপ দূর হইবে।—(পৃঃ ১৮৫)

* * * * *

দিব্য-চ্ছবি—

পরলোকে এমন স্থান আছে, যেখানে সভা আছে, যেখানে বিচ্ছিন্ন যোগী ধ্যান করেন, ইহা যেমন সত্য, তেমনই ঈশ্বর-প্রেমিকগণ দলবদ্ধ হইয়া ভক্তি-সরোবরে অবগাহন করেন, ইহাও সত্য।—(পৃঃ ১৮৮)

মনুষ্যের প্রকৃতি জানিয়া ঈশ্বর অতিশয় হৃদয়গ্রাহী এক একখানি ছবি টাঙ্গাইয়া রাখিয়াছেন। সুখ দুঃখের সময় সেই ছবি দেখিতে হইবে।—(পৃঃ ১৮৯)

যাঁহারা সংযুক্ত এখানে, তাঁহারা সংযুক্ত পরলোকে। এক প্রেম-সাগরে সন্তরণ করেন। এক প্রাণ-সখাকে লইয়া সকলে সুখী।—(পৃঃ ১৮৯)

*   *   *   *   *

চির-বন্ধুতা—

মিলন হইলেই বিচ্ছেদ হয়, বিচ্ছেদ হইলেই প্রেমিক-হৃদয় জিজ্ঞাসা করে, আবার কবে মিলন হইবে? আবার এইরূপে সুখে বসিয়া সদালাপ করিব কবে? যাহার বিশ্বাস এবং প্রেম অল্প, সে নিরুত্তর থাকিবে; কিন্তু প্রেমিক বলিবে, নিশ্চয়ই আবার দেখা হইবে। স্বর্গধাম, যেখানে ভক্তগণ বাস করেন, এখানে নহে, ওখানে। সেখানে নিশ্চয়ই পুনর্ম্মিলন হইবে।—(পৃঃ ১৯৩)

ঈশ্বর যাহাদিগকে একত্র করেন, মৃত্যুও তাহাদিগকে বিচ্ছিন্ন করিতে পারিবে না। যদি একবার শুভ মিলন হইল এবং মৃত্যুও যদি তাহা বিনাশ করিতে না পারে, তাহা হইলে আমাদের বন্ধুতা চিরস্থায়ী হইল। মৃত্যু-ঘটনায় আমাদের বন্ধুতা এই পৃথিবীতে শেষ হইবে, কিন্তু চিরকালের জন্য শেষ হইবে না। আরও দৃঢ়তর বিশ্বাসের সহিত পরলোকে সম্মিলিত হইব।—(পৃঃ ১৯৪)

*   *   *   *   *

ধ্যান এবং প্রেম—

দয়াসিন্ধু, তোমার কৃপাতে বুঝিলাম, তোমার ভিতরে আবার সকলকে পাইব। মনুষ্য-জাতির সকল শাখা এক হইবে। যত পরিবার ঐখানে গিয়া এক-পরিবার হইবে।—(পৃঃ ২২৮)

*   *   *   *   *

ব্রহ্মতেজ—

সে বস্তু অনন্তকালের ব্যাপার, তাহার উপরে কালের মৃত্যুর আধিপত্য নাই।—(পৃঃ ২৬৯)

শরীর ক্ষয় হউক না কেন, শরীর যখন নষ্ট হয়, তখনই তো আত্মা স্ফূর্ত্তি প্রকাশ করে। পিঞ্জর ছাড়িয়া যখন পাখী উড়ে, তখনই তো ডানার অধিক বল প্রকাশিত হয়।—(পৃঃ ২৬৯)

* * * * *

স্বর্গ এবং পৃথিবীর কথোপকথন—

বাস্তবিক উপাসনা স্থানে স্বর্গ আছে। যদি কোনও স্থানে স্বর্গ অবতীর্ণ হইয়া থাকেন, তাহা এই উপাসনা-স্থানে।—(পৃঃ ২৮২)

যখনই দুঃখ যন্ত্রণায় মন নিপীড়িত হইবে, তখনই এক একবার স্বর্গের কথা শুনিবে। সকল যন্ত্রণা দূর হইবে। স্বর্গের কথা এমনই মিষ্ট।—(পৃঃ ২৮৫)

আচার্য্যের উপদেশ—অষ্টম খণ্ড।

বীজে স্বর্গ, কি ফলে স্বর্গ—

ঈশ্বরের নামই স্বর্গ, ঈশ্বরকে ডাকাই স্বর্গ। ঈশ্বর-সম্পর্কীয় সমুদয় ব্যাপারের মধ্যেই স্বর্গ।—(পৃঃ ৯২)

* * * * *

ঈশ্বর ও মনুষ্যের শাসন—

ঈশ্বরও কষ্ট দেন, দুঃখ দেন, হৃদয়ে আগুন জ্বালিয়া দেন, কিন্তু তিনি পাপীকে যে বাণ দ্বারা বিদ্ধ করেন, তাহা বিষাক্ত নহে, সে বাণের ভিতরে প্রেম আছে।—(পৃঃ ১৭৪)

ঈশ্বরের বাণ মুহূর্ত্তের মধ্যে বিদ্ধ করিয়া শান্তি আনয়ন করে, ঈশ্বরের অগ্নি মুহূর্ত্তের মধ্যে সোণার ময়লা নির্গত করিয়া বিশুদ্ধ করিয়া ফেলে।—(পৃঃ ১৭৫)

* * * * *

সংসার ঈশ্বরের মন্দির—

আমরা মৃত্যুর পর কোথায় যাইব? স্বর্গধামে যাইব।—(পৃঃ ১৮৯)

* * * * *

বিপদে ঈশ্বরের দয়া—

বাহিরে যত অন্ধকারে ঘেরিবে, ততই অন্তরে উজ্জ্বল ব্রহ্মরাজ্য প্রকাশ পাইবে।—(পৃঃ ২৬৭)

ব্রহ্মে লীন হও, আরও তাঁহাকে ভালবাসিতে থাক, সুখ শান্তি তোমাদেরই।—(পৃঃ ২৬৭)



আচার্য্যের উপদেশ—নবম খণ্ড।

সুখবেদ, দুঃখবেদ—

সুখের বেদ পাঠ করা যেমন আবশ্যক, দুঃখের বেদ পাঠ করা তেমনই আবশ্যক।—(পৃঃ ২৪)

যিনি ঈশ্বরের দুঃখী সন্তান, দুঃখ তাঁহাকে ঈশ্বর সম্বন্ধে এমন দিকে রাখে যে, সেই দিক হইতে তিনি ঈশ্বরের করুণা সহস্র গুণ দেখিতে পান। দুঃখের অবস্থায় এমন ভাবে তাঁহার দিকে তাকান যায় যে, তাঁহার স্নেহ ভিন্ন আর কিছু দেখিতে পাওয়া যায় না।—(পৃঃ ২৮)

তাই বলি, ঈশ্বর যাহাকে দুঃখ দেন, তাহাকে বড় ভালবাসেন।

তিনি চক্ষু কাণা করিয়া দিলেন কেন? খুব ভালবাসিবেন বলিয়া! তিনি খুব ভালবাসেন বলিয়াই কষ্ট দেন, পয়সা কাড়িয়া লন, সংসারের দুঃখ যন্ত্রণা বৃদ্ধি করেন। এই যে সমুদয় দুঃখ দেখিতেছি, ইহা কি জননীর স্নেহের লীলা? সমুদয় স্বর্গের ইতিহাস বলিতেছে, হাঁ, সাধকের প্রতি অতুল স্নেহ প্রকাশ করিবার জন্য তিনি এই সকল লীলা করিতেছেন।—(পৃঃ ২৯)

ভাগ্যে দুঃখ হইল বলিয়া কাতর অন্তরে ডাকিলাম, তাই তাঁহার প্রেমমুখ দেখিলাম; রৌদ্রে উত্তপ্ত হইয়া দৌড়িলাম, তাই তাঁহার শ্রীপদ-চ্ছায়া লাভ করিলাম। ভাগ্যে শুষ্ক কণ্ঠ হইল, তাই প্রেম-সাগরের প্রেমামৃত পান করিতে সক্ষম হইলাম। দুঃখ না হইলে পিতার মর্য্যাদা কেহ বুঝিতে পারে না।—(পৃঃ ২৯)

দুই বৎসর চেষ্টা করিয়া তাঁহার যে মহিমা বুঝিতে পারা যায় না, দুঃখে পড়িলে মুহূর্ত্ত মধ্যে সে মহিমা বুঝিতে পারা যায়।—(পৃঃ ২৯)

নিশ্চয় বলিব, আকাশ ফাটাইয়া বলিব, হাসাইবার জন্য নয়, সরল ভাবে বলিব, আমাদিগকে সুখী করিবার জন্য, নির্ম্মল-চরিত্র করিবার জন্য ঈশ্বর এত দুঃখের সৃষ্টি করিয়াছেন।—(পৃঃ ৩০)

যত তিনি আমাদিগকে কষ্ট দিবেন, তত বুকে জড়াইয়া ধরিবেন।—(পৃঃ ৩১)

সুখ আইসে গ্রহণ কর, কিন্তু দুঃখকে আদরের সহিত আলিঙ্গন কর।—(পৃঃ ৩২)

* * * * *

আধ্যাত্মিকতা।—

মনুষ্যের শরীর-রক্ষা যেমন আবশ্যক, আধ্যাত্মিক হওয়া তেমনই আবশ্যক।—(পৃঃ ৩২)

যিনি ব্রহ্মের সাধক, ব্রহ্ম তাঁহার অন্ধকার আত্মার ভিতরে একটী রাজ্য নির্ম্মাণ করেন, তিনি সেই ঘোর অন্ধকার হইতে একটী বৃহৎ জগৎ প্রকাশিত করেন। ঈশ্বর ঘোর অন্ধকার মধ্যে প্রবিষ্ট করিয়া সাধককে শিখান, প্রকাণ্ড বিশ্ব কিছুই নয়। ঈশ্বর সাধককে বলেন, "হে ভক্ত, চক্ষু বন্ধ কর, দেখিকে পলকের ভিতরে বিশ্ব নাই। তুমি এই অন্ধকারের ভিতরে পবিত্র ইচ্ছা লইয়া উপবেশন কর, একটী মূর্ত্তিমান নূতন জগৎ দেখিতে পাইবে।" সাধক সেই আদেশ পালন করিতে চেষ্টা করিলেন।—(পৃঃ ৩৩)

আধ্যাত্মিক জগতে সময়ে সময়ে বাস না করিলে কিছুই থাকিবে না। যাহা কিছু ছিল, আছে, থাকিবে, তাহা উহারই মধ্যে।—(পৃঃ ৩৪)

অন্ধকার ভেদ করিয়া হৃদয়-জগতে ইহলোকেই পারলৌকিক মিলন হয়।—(পৃঃ ৩৪)

অন্তরের মধ্যে একটী জগৎ নির্ম্মাণ করিতে হইলে প্রবলতর ইচ্ছা চাই। ব্যাকুল ভাবে ইচ্ছা করিলে ইচ্ছা মাত্র পরলোকবাসী সকলকে ডাকিয়া আনিয়া মনের ভিতরে বক্ষের মধ্যে বসান যায়। ইচ্ছা করিলে তাঁহাদিগকে চিরকালের জন্য হৃদয়ের মধ্যে রাখিতে পারা যায়। কে কে আসিয়াছেন জানিয়া তাঁহাদিগকে চিরকালের জন্য আয়ত্ত করা যায়।—(পৃঃ ৩৫)

* * * *

ধার্ম্মিক সংসারী—

যিনি স্বর্গ-রাজ্যের অধিকারী, পৃথিবীর ঘোর দুঃখ-বিপদের মধ্যেও তাঁহার মুখ কেমন প্রফুল্ল।—(পৃঃ ১০৮)

* * * * *

প্রকৃতির ঈশ্বর—

প্রকৃতির মধ্যে প্রবেশ করিলে, প্রকৃতি সহায় হইলেই, মনের মানুষ অন্তরাত্মাকে দেখিয়া সুখী হয়।—(পৃঃ ১৮৫)

গাছ বল, পাখী বল, ফুল বল, জল বল, বায়ু বল, প্রকৃতির মধ্যে যাহা কিছু দেখিতে পাও, সকলই সেই রাজ্যের ব্যাপার। তাঁহারা সকলেই সাধকদিগকে স্বর্গরাজ্যে লইয়া যাইবার জন্য সেখান হইতে আসিয়াছেন।—(পৃঃ ১৮৫)

* * * * *

উত্তরদাতা জাগ্রত ঈশ্বর—

ঘোর বিপদ প্রলোভনের মধ্যে হরি রক্ষা না করিলে আর বাঁচিতে পারিবে না। হরির কথা না শুনিলে কেহই বাঁচিতে পারিবে না; কিন্তু সেই সময় আসিতেছে, যখন তুমি আমি যেমন কথা কহিতেছি, তেমনি ব্রহ্ম আমাদের সঙ্গে কথা কহিবেন। অতএব ব্রাহ্মের হৃদয় সাধকের হৃদয় হউক! ব্রহ্মের কথা সুমিষ্ট, শুনিতে ভাল লাগিবে। সেই কথা মধুময়, সুধাময়, অমৃতের সমান, তাহাতে জ্ঞান হয় এবং শোক দুঃখ যায়।—(পৃঃ ১৯৮)

হরি ভব-কাণ্ডারী হাল ধরিবেন। আমরা নিরাপদে নৌকায় বসিয়া, আস্তে আস্তে নৌকা চলিতেছে দেখিব; হরি হাল ধরিয়াছেন দেখিয়া, নির্ভয় এবং নিশ্চিন্ত হইয়া শান্তিধামে চলিয়া যাইব।—(পৃঃ ১৯৯)

* * * * *

শরীর ব্রহ্মমন্দির—

ব্রহ্ম-অর্চ্চনা করিতে করিতে ভিতরের ব্রহ্মাগ্নি বাহিরে আসিবে, বাহিরের ব্রহ্মাগ্নি ভিতরে প্রবেশ করিবে। এই রূপ সাধন করিতে

করিতে সমস্ত পাপবন্ধন ছিন্ন হইবে এবং জীবাত্মা পরিত্রাণ লাভ করিবে।—(পৃঃ ২০৪)

*　　*　　*　　*　　*

ভক্তদল-বৃদ্ধি—

স্বপ্নেতে পৃথিবী দেখা যায়, জাগ্রত অবস্থায় পরলোক দেখা যায়। যে ইহলোকের ধন সম্পদ দেখিতেছে, সে স্বপ্ন দেখিতেছে, যিনি পরলোক ও পরলোকবাসী যাজ্ঞবল্ক্য, ঈশা, মুষা প্রভৃতি প্রেরিত মহাপুরুষ সকলকে দেখিতেছেন, তিনি জাগ্রত। স্বপ্নেতে মনুষ্য পৃথিবী সাধন করে, জাগ্রত অবস্থায় মনুষ্য পরলোকে বাস করে। চক্ষু খুলিলে যদি পরলোক দেখিতে পাও, তবে তোমাদের জাগ্রত অবস্থা। যতই তোমাদের আত্মার চক্ষু উজ্জ্বল হইবে, ততই তোমাদের ঐহিক সুখের স্বপ্ন নষ্ট হইবে, এবং জীবনের প্রাতঃকাল দেখিতে পাইবে।—(পৃঃ ২০৫)

যদি জাগ্রত হইতে চাও, তবে সেই পরলোকবাসী সাধুদিগকে দেখ। —(পৃঃ ২০৬)

ভয়ানক মৃত্যু সমক্ষে, দৌড়িয়া প্রাণ-রক্ষা করিতে ইচ্ছা হইতেছে; কিন্তু স্বপ্নে দৌড়িতে পারি না, অগ্রসর হইতে পারি না, বল নাই, মনে তেজ নাই। পরলোকের যাত্রিগণ, যদি চলিতে চাও, যদি দৌড়িয়া অমৃতধামে যাইতে চাও, তবে স্বপ্নের অবস্থা হইতে উন্মুক্ত হও।—(পৃঃ ২০৭)

*　　*　　*　　*　　*

ভবিষ্যতের সন্তান—

কিন্তু এখন দেখিতেছি, ঈশ্বর আমাদিগকে উচ্চ হইতে উচ্চতর, নির্ম্মল হইতে নির্ম্মলতর আলোক-রাজ্যে লইয়া যাইতেছেন। এই বর্ত্তমান আলোকের অবস্থাও আমাদিগের পূর্ণাবস্থা নহে, ইহা কেবল

আমাদিগের ধর্ম্মজীবনের প্রাতঃকাল, এই জীবন ক্রমশঃ মধ্যাহ্ন সূর্য্যের ন্যায় আলোকময় হইবে।—(পৃঃ ২৩২)

অগ্রগামী ব্রাহ্ম হইয়া অগ্রসর হও। ঐ ঘরে গিয়া সকলে ব্রহ্মানন্দ-রস পান করিব, এই আমাদের জীবনের লক্ষ্য।—(পৃঃ ২৩৫)

* * * * *

দীক্ষিতদিগের প্রতি উপদেশ—

ঐ দেখ, সমক্ষে দীন-কাণ্ডারী তাঁহার চরণতরী লইয়া দাঁড়াইয়া আছেন, তোমরা ঐ নৌকায় আরোহণ করিয়া ভবসাগরের উপর দিয়া শান্তিধামে চলিয়া যাও।—(পৃঃ ২৩৯)

* * * * *

পরলোকবাসী সাধু—

কত সাধু আছেন, যাঁহাদিগকে দেখি নাই, নাম শুনি নাই, পরলোকে তাঁহাদের সঙ্গে দেখা হইবে।—(পৃঃ ২৭৭)

* * * * *

স্বর্গীয় কল্পনা—

পরলোক স্বর্গ যাহা কিছু আত্মা ভাবিবে, উহাতে কল্পনা নাই।—(পৃঃ ২৯৪)

* * * * *

নূতন দ্বৈত ও অদ্বৈতবাদ—

জীবন সাধন দ্বারা উন্নত হইলে দেখিতে পাওয়া যায়, দুঃখ মঙ্গলের কারণ, অন্ধকার উন্নতির কারণ, বিপদ মৃত্যু সম্পদ। বিশ্বাসী নয়ন এ সকলের মধ্যে কাল কিছুই দেখিতে পায় না। উহা কোন অশুভ চিহ্ন চাহিল না। যাহা ঘটিতেছে, তাহার মধ্যে সকলই মঙ্গল দেখিবে।—(পৃঃ ৩০০)

বিশ্বাস আর কিছু করে না, চুপ করিয়া পরলোকে গিয়া মর্ম্ম জানিয়া আইসে। তখন বিশ্বাস এক একটী ঘটনার মহিমা দর্শন করে, উহা কেমন কল্যাণকর। উহা হইতে কেমন পবিত্রতা সমুৎপন্ন হয়, হৃদয়ঙ্গম করে।—(পৃঃ ৩০০)

মুক্তিদাতা ঈশ্বর যখন কল্যাণের প্রেরয়িতা, তখন একটী ঘটনা হইতে, বিপদ হইতে, মন্দ হইতে পারে না।—(পৃঃ ৩০১।

মৃত্যু কিছুই নয়, এ ঘর হইতে ও ঘরে যাওয়া। কোটী কোটী লোক মরিতেছে, তাহারা এখান হইতে ওখানে যাইতেছে।—(পৃঃ ৩০১)

আচার্য্যের উপদেশ—দশম খণ্ড।

অঙ্গীকৃত দেশ—

ব্রাহ্মধর্ম্ম-প্রসাদে এখন আমরা ঈশ্বরের অঙ্গীকৃত নূতন রাজ্যের দিকে যাইতেছি। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে এই নূতন রাজ্যের প্রতি আমাদিগের তেমন উজ্জ্বল বিশ্বাস ছিল না। পথিকেরা যতই গম্য-স্থানের নিকটবর্ত্তী হইতেছে, ততই সেই রাজ্য উজ্জ্বলতর দেখা যাইতেছে। দর্শন এবং শ্রবণ দ্বারা আমরা সেই রাজ্যের প্রমাণ পাই-তেছি। দূর হইতে সেই দেশ দৃষ্ট হইতেছে এবং সেই দেশের শব্দগুলি ক্রমে ক্রমে কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইতেছে। যতই সেখানকার সুমধুর প্রেমধ্বনি কর্ণে প্রবেশ করিতেছে, ততই প্রতীত হইতেছে যে, আনন্দধামের নিকটে আসিতেছি। যাত্রীদিগের পক্ষে সেই সুখধাম, সেই প্রেমরাজ্য নিকট হইল। ব্রাহ্মসাধকদিগের পক্ষে মহাত্মাদিগের সহবাস মিষ্টতর হইতেছে, পরলোকের শোভা অধিকতর মনোহর

হইতেছে এবং স্বর্গের প্রেমফুলের সৌরভ সাধকদিগকে আমোদিত করিতেছে। আগে কথনও কথনও দুই একজন সাধু আমাদিগের নয়ন-গোচর হইতেন, এখন কত যোগী ঋষিদিগের আশ্রমে, কত প্রেমিক ভক্তদিগের কুটীরে আমরা প্রবেশ করিতেছি। পূর্ব্বে স্বর্গ-রাজ্যের শোভা অনুমান দ্বারা সিদ্ধান্ত করিতে হইত, নয়ন সাক্ষ্য দান করিতে পারিত না, এখন প্রত্যক্ষরূপে স্বর্গের সৌন্দর্য্য দেখিয়া মোহিত হইতেছি। এখন স্পষ্টতররূপে ব্রহ্মদর্শন হইতেছে। ব্রহ্ম-সহবাস, সাধু-সহবাস মিষ্টতর হইতেছে।—(পৃঃ ৩৪)

ঈশ্বর সেই দেশে বসিয়া আছেন। কত সুমধুর বাক্য বলিয়া, কত প্রলোভন দেখাইয়া তিনি আমাদিগকে সেই দেশে লইয়া যাইতেছেন। —(পৃঃ ৩৫)

ধন্য তাঁহারা, যাঁহারা সেই রাজ্যের দিকে চলিয়াছেন! সেই রাজ্য ভক্তি-রাজ্য, সেই রাজ্য আনন্দ-রাজ্য, শান্তি-রাজ্য।—(পৃঃ ৩৮)

*   *   *   *   *

শ্রীচৈতন্য—

যেখানে হরির পাদপদ্ম, সেইখানেই স্বর্গ। রিপু জয় করিয়া, এখনই যদি আকুল-প্রাণে হরিকে ডাক, স্বর্গ এখনই দেখিবে।—(পৃঃ ৭০)

*   *   *   *   *

বেদ পুরাণের মিলন—

যিনি ব্রহ্মকে মা বলিয়া ভালবাসেন, তাঁহার আর দুঃখ থাকে না। সেই জগজ্জননীর অঞ্চল ধরিয়া আমরা আনন্দে বৈকুণ্ঠে চলিয়া যাইব, এবং এই সংসারেই স্বর্গ-ভোগ আরম্ভ করিব।—(পৃঃ ৭৭)

*   *   *   *   *

সত্য গয়া—

আত্মার মধ্যে এমন একটী স্থান আছে, যে স্থান দিয়া আমাদিগের পূর্ব্ব পুরুষেরা স্বর্গধাম পরলোকে চলিয়া গিয়াছেন। সেই স্থানে যোগ সাধন করিতে করিতে, পরলোকবাসী মহাত্মাদিগের সঙ্গে আমাদিগের মিলন হয়। সেই স্থান হইতে সুবিস্তৃত পরলোক দেখা যায়।—(পৃঃ ৯২)

মনে করিও না, পরলোক অনেক দূরে। পরলোক অতি নিকটে, তোমাদিগের প্রাণের মধ্যে, তোমরা ভক্তি-প্রেম-হস্ত প্রসারণ করিলেই পরলোক ধারণ করিতে পাইবে। যে চক্ষে ব্রহ্মকে দেখি, সেই চক্ষে পরলোকবাসী সাধুদিগকে দেখিতে পাই।—(পৃঃ ৯২)

বাল্যকালে মনে করিতাম, পরলোক বহু দূরে; কিন্তু এখন দেখিতেছি, বিশ্বাসীর এক হস্তে নিরাকার সর্ব্বব্যাপী ব্রহ্ম এবং আর এক হস্তে পরলোকবাসী সাধু মহাত্মাগণ। এক হস্তে ব্রহ্ম, অন্য হস্তে পরলোক।—(পৃঃ ৯৩)

স্বর্গ বাহিরে নহে, আকাশে, পর্ব্বতে কিম্বা সমুদ্রে স্বর্গ নহে। যথার্থ স্বর্গ আমাদিগের চিত্তের ভিতরে।—(পৃঃ ৯৩)

যেমন ঈশ্বর প্রত্যক্ষ, তেমনই পরলোক প্রত্যক্ষ। পরলোক আমাদিগের আসল বাড়ী, পরলোক জীবের শান্তি-নিকেতন। সেই নিকেতন নিত্যকালের আবাসস্থান।—(পৃঃ ৯৪)

*   *   *   *   *

সংসারে স্বর্গভোগ—

অশরীরী আত্মা, সকলেই অরূপ অথচ প্রতিজনেরই মনোহর রূপ আছে।—(পৃঃ ১৭২)

ভবিষ্যতে শুভক্ষণ আসিবে বলিয়া বিলম্ব করিও না। যেখানে পাপ দুঃখ অশান্তি নাই, সেখানে যাইতে কেন বিলম্ব করিবে? তখন ঊর্দ্ধশ্বাসে সেই স্বর্গের ঘরে যাইবে। সেখানে নানা জাতীয় ফুল দেখিয়া তোমাদিগের প্রাণ সুখী হইবে। ঈশা, মুসা, নানক, জনক, সীতা, সাবিত্রী প্রভৃতি যাঁহারা এখান হইতে চলিয়া গিয়াছেন, সেই স্বর্গের ঘরে বাস করিতেছেন। দেখবে চমৎকার শোভা! এখানে যত সাধ্বী ছিলেন, সকলে সেখানে গিয়া বসিয়া আছেন। যখন পৃথিবীতে শোক সন্তাপ পাইবে, তখন সেই স্বর্গে যাইবে। তোমাদের প্রতিজনের বুকের ভিতর প্রেম দ্বার আছে, সেই দ্বার খুলিলে একটী কুটীর দেখিতে পাইবে, সেখানে ঈশ্বর নিত্য কালের জন্য আপনার স্বর্গধাম খুলিয়া রাখিয়াছেন। সেই কুটীর মধ্যে গিয়া জগদীশ্বরীকে বলিবে, মা, আমি কি স্বর্গে স্থান পাইব না? যে একবার বলে, আমি ঈশ্বরকে চাই, সে ঈশ্বরকে পায়। তোমরা যদি বল, আমরা পৃথিবীতে থাকিব না, আমরা আমাদের প্রাণের স্বর্গীয়া ভগ্নীদের সঙ্গে থাকিব, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তোমরা স্বর্গের অধিকারিণী হইবে। যেখানে নিত্যানন্দ প্রভু আপনার ছেলে মেয়েদের নিয়ে নিত্য উৎসব করিতেছেন, সেখানে গেলে আর দুঃখ থাকে না।—(পৃঃ ১৭৪)

স্বর্গের ছেলে মেয়েরা মার কাছে বসে আছেন। তাঁদের যদি বাছা বলে আদর করিতে পার, তরিয়া যাইবে। নিরাকার মাকে ডাকিলে, নিরাকার ভাই ভগ্নীকেও পাওয়া যায়।—(পৃঃ ১৭৫)

* * * * *

জলাভিষেক—

যেমন শরীর জলে প্রবিষ্ট হয়, জলও শরীরে প্রবিষ্ট হয়। সেইরূপ যেমন জীবাত্মা নূতন বস্ত্র পরিয়া পরমাত্মাতে প্রবেশ করে, পরমাত্মাও

প্রাণরূপে, জ্ঞানরূপে, ভক্তি শান্তিরূপে জীবের হৃদয়ে প্রবেশ করেন। —(পৃঃ ১৮০)

*   *   *   *   *

ঈশ্বরের শত্রু—

ইহপরলোকে যত সাধু ভক্ত বাস করিতেছেন, তাঁহারা তোমাদিগের বন্ধু। বিনীত ও বিশ্বাসী হইয়া তাঁহাদিগের স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ কর।—(পৃঃ ২১৭)

*   *   *   *   *

পরলোকবাসী ভক্ত-দর্শন—

নিরাকার জীবাত্মা নিরাকার ঈশ্বরকে দেখিতেছে; এবং নিরাকার ঈশ্বরের সঙ্গে সঙ্গে নিরাকার অমরাত্মা সকলকেও দেখিতেছে। —(পৃঃ ২১৮)

স্বর্গ ঈশ্বরেতে, ঈশ্বর নিজেই স্বর্গ। সুতরাং যত ঈশ্বরের মধ্যে প্রবেশ করিব, ততই সেই স্বর্গবাসী সাধুদিগকে নিকটে দেখিব।—(পৃঃ ২২০)

যখনই বিশ্বাসের সহিত বলিবে, এই আমার ঈশ্বর, এই আমার ভক্তিভাজন স্বর্গবাসিগণ, তখনই তাঁহাদিগকে হস্তগত করিতে পারিবে যোগবলে, প্রেমবলে সকল ব্যবধান চলিয়া যায়।—(পৃঃ ২২১)

*   *   *   *   *

বিধান-মাহাত্ম্য—

এই নববিধানের ভক্তেরা মৃত্যুঞ্জয়ের আদেশে, মৃত্যুঞ্জয়ের হস্ত হইতে খড়্গ লইয়া, মৃত্যুকে বধ করিয়া, ইহলোকে থাকিয়াই পরলোকবাসী সাধুদিগের সঙ্গে ব্রহ্মপূজা করিতেছেন। ইহলোক পরলোকের

মধ্যে যে ব্যবধান ছিল, নববিধান তাহা বিনাশ করিয়াছে। ইহলোক পরলোক মধ্যে এখন সেতু নির্ম্মিত হইয়াছে। যেমন কলিকাতার লোক এখন সেতু পার হইয়া হাওড়ায় বেড়াইতে পারে, সেইরূপ এখন ইহলোক হইতে অনায়াসে পরলোকে যাওয়া যায়।—(পৃঃ ২২৪)

ঈশ্বরের নিকটে ইহলোক পরলোকের ভিন্নতা নাই। যখন সাধকের নিকটে ঈশ্বর প্রকাশিত হন, তখন পলকের মধ্যে তিনি সাধকের চক্ষে স্বর্গবাসী পরলোকগত সাধুদিগকেও দেখাইয়া দেন। পৃথিবী ও স্বর্গকে এক করিয়া দিবার জন্য নববিধানের অভ্যুদয়। ঈশ্বর দর্শন এবং স্বর্গ-দর্শন সহজ হইল।—(পৃঃ ২২৫)

* * * * *

সাধুর রক্ত-মাংস পান-ভোজন—

পরলোকবাসী মহাত্মারা দেশকালের অতীত।—(পৃঃ ২২৭)

* * * * *

আর্য্যনারীদিগের প্রতি আচার্য্যের উপদেশ—

বড় বড় জাহাজ করিয়া ব্রহ্মকন্যাগণ ভবনদী পার হইতে লাগিলেন। কোন জাহাজের উপর "একমেবাদ্বিতীয়ম্", কোন জাহাজের উপর "ব্রহ্মকৃপা হি কেবলম্" ইত্যাদি নিশান উড়িতেছে। ভবনদীর ওপারে শান্তিধামের দেব-দেবীগণ ব্রহ্মকন্যাদিগকে গ্রহণ করিবার জন্য প্রতীক্ষা করিতেছেন। সেই প্রাচীনকালের ঋষি এবং ঋষিপত্নীগণ, সেই যাজ্ঞবল্ক্য, মৈত্রেয়ী, সেই চৈতন্য, নানক, কবীর, তুকারাম প্রভৃতি, সেই সীতা, সাবিত্রী এবং অন্যান্য পুণ্যবতী নারীগণ, যাত্রীদিগকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য ভবনদীর অপর পারে দাঁড়াইয়া আছেন। বঙ্গদেশ হইতে জাহাজ আসিতেছে, জাহাজ ক্রমশঃ শান্তি-উপকূলের নিকটবর্ত্তী হইতেছে, উহা দেখিয়া

সেই দেবর্ষি এবং তাঁহাদিগের কন্যাগণের কত আহ্লাদ!—(পৃঃ ২৩৭)

ঈশ্বর তোমাদের জন্য নৌকা লইয়া আসিয়াছেন। তোমরা আনন্দ-মনে তাঁহার নাম উচ্চারণ করিতে করিতে এই নৌকায় আরোহণ করিয়া নূতন দেশে চলিয়া যাও।—(পৃঃ ২৩৮)

* * * * *

বিশ্বাসের উচ্চ ভূমি—

বিশ্বাসের উচ্চ ভূমি আরোহণ করিলে, ইহলোকে থাকিয়া পরলোক দেখা যায়। বিশ্বাসের ভূমি হইতে নরলোকের ব্যাপার এবং স্বর্গলোকের ব্যাপার উভয়ই দেখা যায়।—(পৃঃ ২৩৯)

* * * * *

আত্মা-পক্ষী—

তোমাদের শরীরের ভিতর যে দেখে শুনে, যে ভাবে, যে চিন্তা করে, সেই আত্মা। এই দেহ পিঞ্জর মধ্যে আত্মা-পক্ষী, মানস-পক্ষী বাস করিতেছে। যোগচক্ষু, জ্ঞানচক্ষু সেই পক্ষীকে দেখিতে পায়।—(পৃঃ ২৪৪)

মন-মানুষের কাপড় এই শরীর। কাপড় ফেলিয়া দিলে যেমন শরীর যায় না, সেইরূপ শরীর ফেলিয়া দিলে মন যায় না।—(পৃঃ ২৪৫)

শরীরটী মন-পাখীর খাঁচা, দশ দিন পরে যেখানকার খাঁচা সেইখানে পড়িয়া থাকিবে; কিন্তু পক্ষী স্বধামে চলিয়া যাইবে। যে খায়, যে শোয়, সে মানুষ নহে। তোমার নাম যদি কেদার কিম্বা রাম হয়, তোমার আত্মাই কেদার কিম্বা রাম। শরীর কেদার কিম্বা রাম নহে। আত্মাই আমি, শরীর আমার। নাম উপাধি সমুদয়

সেই আত্মার। শরীর খড়ের ঘর মাত্র, বাঁশ দিয়া বাঁধা; তাহার আদর কেবল তাহার মালিকের জন্য।—(পৃঃ ২৪৫)

সেখানে পরমাত্মা জীবাত্মা-পক্ষীকে আহার দিতেছেন ও বলিতেছেন, "খাও এবং গাও"। অনন্তকাল তিনি এই কথা বলিবেন। আত্মা সেই অনন্ত শক্তি আদ্যাশক্তির পুত্র। ইহার আহার বিহার সেই শক্তিতে। নিজের কোন ক্ষমতা নাই। মার শক্তিতে শক্তিমান্, মার ধনে ধনবান্। আবার যখন সেই আদ্যাশক্তি আত্মাকে সৃজন করিলেন, তাহার ভিতরে কত অদ্ভুত তেজোময় পদার্থ নিহিত করিলেন। যেমন ময়ূর-পক্ষী নানাবর্ণে সুশোভিত, তেমনই প্রত্যেক জীবাত্মা-পক্ষী বিচিত্র সুন্দর বর্ণে সুসজ্জিত।—(পৃঃ ২৪৬)

আমাদের প্রত্যেকের আত্মার ভিতরে যোগের বল, ভক্তির বল আছে।—(পৃঃ ২৪৭)

* * * * *

গমনাগমন—

পৃথিবীতে আসিবার পূর্ব্বে অথবা জন্মিবার পূর্ব্বে ব্রহ্মের ভিতরে আমরা নিদ্রিত ছিলাম।—(পৃঃ ২৫১)

আধ্যাত্মিক জীবন সম্বন্ধে স্বয়ং ঈশ্বর আমাদিগের জন্মদাতা।—(পৃঃ ২৫১)

মনুষ্যের যথার্থ জন্মস্থান স্বর্গ। স্বর্গ তাহার পিতৃভূমি, স্বর্গ তাহার মাতৃভূমি।—(পৃঃ ২৫২)

ঈশ্বরের নিকট আগমন ভিন্ন মনুষ্যের পরিত্রাণ নাই, সুখ শান্তি নাই।—(পৃঃ ২৫৫)

আমরা প্রতিজনেই যেখান হইতে আসিয়াছি, আবার সেখানে

যাইব। ঈশ্বরের বক্ষ হইতে আসিয়াছি, আবার ঈশ্বরের বক্ষের ভিতরে গিয়া বসিব।—(পৃঃ ২৫৬)

ঈশ্বরের ইচ্ছারূপে, ঈশ্বরের শক্তিরূপে ছিলাম। আবার নিজের ইচ্ছা নির্ব্বাণের পর, ঈশ্বরের ইচ্ছার অন্তর্গত হইয়া থাকিব। ইহাই মুক্তি, ইহাই সমাধি।—(পৃঃ ২৫৭)

সেই যে অনন্ত নির্ব্বাণ, এবং অনন্ত শান্তির আলয় ঈশ্বরের গৃহ, সেই গৃহে তোমাদের শুভাগমন হউক। যাঁহার বক্ষ হইতে আসিয়াছ, আবার সেখানে গিয়া চিরকালের শান্তি সম্ভোগ কর।—(পৃঃ ২৫৮)

*   *   *   *   *

বসন্তোৎসব—

ইহলোকে থাকিয়াই আমরা পরলোকবাসীদিগের সঙ্গে যোগ নিবদ্ধ করিতেছি। তাঁহাদিগের আত্মা এখানেই আমাদিগকে বিশুদ্ধ এবং প্রফুল্ল করিতেছে।—(পৃঃ ২৬৫)

আত্মার চিরবসন্ত যথার্থ মোক্ষ-ধামের অবস্থা।—(পৃঃ ২৬৮)

যেমন জড়রাজ্যে সুশীতল সমীরণ উত্তপ্ত শরীরকে স্নিগ্ধ করে, সেইরূপ ধর্ম্মরাজ্যে শান্তিসমীরণ আসিয়া পাপতাপে উত্তপ্ত আত্মা সকলকে সুস্নিগ্ধ করে।—(পৃঃ ২৬৯)

ফুল ঈশ্বরের হস্ত হইতে আসিতেছে। ফুল স্বর্গের উৎকৃষ্ট বস্তু।—(পৃঃ ২৭১)

সেবকের নিবেদন—প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড।

আত্মাশক্তি—

তাঁহার সকল শক্তি জীবের হিতের জন্য।—(পৃঃ ৭১)

*   *   *   *   *

আমার মা সত্য কি না ?—

সেই মাকে দর্শন করিতে করিতে ক্রমে এমন গভীর আনন্দের ভিতরে পড়িবে যে, মাতৃদর্শন ভিন্ন তোমার আর কিছুই ভাল লাগিবে না, এবং মাকে ছাড়িয়া আর কোথাও যাইতে পারিবে না। তখন ভিতরে বাহিরে সর্ব্বত্র মাকে দেখিবে। তখন দেখিবে, স্বর্গ মর্ত্ত্য এক হইয়াছে, পৃথিবী দেবলোক এক হইয়াছে, সংসার বৈকুণ্ঠ এক হইয়াছে।—(পৃঃ ১১৭)

তাঁহার কোটিরূপ চারিদিকে বিকীর্ণ। তাঁহাকে দেখিলে পাপ তাপ রোগ শোক সমুদয় চলিয়া যায়।—(পৃঃ ১২০)

* * * * *

যোগানন্দ—

নির্ব্বাণ-সরোবরে ডুব দিয়া যাহারা যোগরাজ্যে গমন করে, তাহারা পরলোকগত মহাত্মাদিগের অব্যবহিত নৈকট্য অনুভব করে। যোগরাজ্যে দেশভেদ জাতিভেদ নাই। যখন জড়রাজ্য ছাড়িয়া, চিন্ময় হইয়া আধ্যাত্মিক লোকে গমন করি, তখন সমুদয় অশরীরী আত্মা ঈশ্বরেতে সংযুক্ত দেখিতে পাই। সেখানে দেবদেব মহাদেব যোগেশ্বরের চিন্ময় যোগ নিকেতন এবং তাহার মধ্যে যোগীদিগের অসংখ্য নিরাকার গৃহ রহিয়াছে।—(পৃঃ ২৭৮)

যখনই তুমি সেই রাজ্যে গিয়া সেই রাজ্যের ঈশ্বরকে পিতা মাতা বলিয়া সম্বোধন করিলে, তিনি তোমাকে আপনার বাগানের নানা প্রকার প্রেম ও পুণ্য ফুলে সাজাইতে লাগিলেন। সেখানে বসিয়া পরলোকবাসী ভক্তদিগের সঙ্গে সহজে একাত্মা হইয়া যাইবে; সেখানে ঈশ্বরের প্রত্যাদেশ, ঈশ্বরের শ্রীমুখের কথা শুনিতে লাগিলে। এক একবার তাঁহার উৎসাহকর কথা শুনিয়া মৃত জীবনে নবজীবনের

সঞ্চার হইতে দেখিলে। সমস্ত জীবন কখন কি করিবে, সেই স্বর্গের পরম বন্ধুর নিকট সমুদয় জানিলে।—(পৃঃ ২৭৮)

যে পরিমাণে ঈশ্বরের সঙ্গে প্রকৃত যোগ, সেই পরিমাণে চিত্তশুদ্ধি এবং আত্মার উজ্জ্বলতা।—(পৃঃ ২৭৯)



সেবকের নিবেদন—তৃতীয় খণ্ড।

ঈশ্বরের সখ্যভাব—

মার ক্রোড়ে ইহলোক পরলোক এক হইল।—(পৃঃ ৪৫)

*   *   *   *   *

ভাগবতী তনু—

আত্মার আধার শরীর। শরীরের আধার আত্মা। শরীরের ভিতরে আত্মা থাকে, আবার আত্মা বিনা শরীর জীবিত থাকিতে পারে না। আত্মাকে অবলম্বন করিয়া শরীর বাঁচিয়া আছে, আত্মা না থাকিলে মৃত শরীর কোন কার্য্য করিতে পারে না। আবার শরীর বিনা আত্মা পৃথিবীতে কোন ক্রিয়া প্রকাশ করিতে পারে না, সুতরাং শরীর যেমন আত্মার আধার, আত্মাও তেমনই শরীরের অবলম্বন। দুই কথাই সত্য। আমরা মনে করি, আত্মা শরীরের মধ্যে থাকে; কিন্তু শরীরের সাহায্যে যে আত্মা ভক্তিরস, যোগরস, জ্ঞানরস, পুণ্যরস ও শান্তিরস লাভ করে, তাহা সর্ব্বদা ভাবিয়া দেখি না। জীবাত্মা এই শরীরের ভিতর দিয়া পৃথিবী হইতে ধর্ম্মমধু, জ্ঞানমধু প্রভৃতি নানা প্রকার সুমিষ্ট রস আহরণ ও সঞ্চয় করে। অতএব শরীর যে আমাদিগের পক্ষে আদরের বস্তু, ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে।—(পৃঃ ৫৪)

জীবাত্মা ধরাধামে এই অসার শরীরের দ্বারা অনন্তকালের প্রচুর সম্পত্তি সঞ্চয় করিয়া পরলোকে গমন করে।—(পৃঃ ৫৫)

* * * * *

দেহতত্ত্ব—

নিঃশ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়া এবং রক্ত-সঞ্চালন ভিন্ন যেমন শরীরের জীবন থাকে না, সেইরূপ প্রেম-ভক্তির রক্ত এবং পবিত্রতার বায়ু ভিন্ন আত্মার ধর্ম্মজীবন থাকে না।—(পৃঃ ১০৬)

প্রাণের প্রাণ ঈশ্বর স্বয়ংই আত্মার মধ্যে পুণ্যের নিঃশ্বাস এবং প্রেমের রক্ত হইয়া বাস করিতেছেন।—(পৃঃ ১০৭)

* * * * *

মন্ত্র এবং ব্রত—

আমার সঙ্গে যিনি কথা কহেন, যিনি আমার কথার উত্তর দেন, যিনি দুর্ব্বলতার সময় বল দেন, পাপ-বিকারের ঔষধ দেন, দুঃখের সময় সান্ত্বনা এবং প্রাণ ভরিয়া সুখ শান্তি দেন, তিনিই আমার বন্ধু, তিনিই আমার জীবনদায়িনী মাতা।—(পৃঃ ১৫৮)

* * * * *

অবতারবাদ—

পরমাত্মার সঙ্গে জীবাত্মার বিশেষ সৌসাদৃশ্য রহিয়াছে। আধ্যাত্মিক স্বভাবের মিলন আছে বলিয়াই মনুষ্যাত্মাকে ঈশ্বরের পুত্র বলা যায়। মনুষ্যাত্মার সঙ্গে যদি পরমাত্মার সৌসাদৃশ্য না থাকিত, তাহা হইলে আমরা ঈশ্বরকে মনুষ্যের পিতা না বলিয়া, তাঁহাকে কেবল মনুষ্যের স্থষ্টিকর্ত্তা বলিতাম।—(পৃঃ ২০৭)

* * * * *

ধর্ম্ম স্বাভাবিক—

চক্ষু যেমন সহজে সৃষ্টি ও সৃষ্টির সৌন্দর্য্য দেখিতে পায়, শ্রোত্র যেমন সহজে বাহিরের শব্দ ও সঙ্গীতাদি শ্রবণ করে, হস্ত যেমন সহজে বাহিরের বস্তু সকল স্পর্শ করে, সেইরূপ অন্তরের বিশ্বাস-চক্ষু যখন সহজে ব্রহ্ম-দর্শন করে, অন্তরের বিবেককর্ণ যখন সহজে ব্রহ্মবাণী শ্রবণ করে এবং হৃদয়ের ভক্তিহস্ত যখন সহজে ব্রহ্ম-পাদপদ্ম স্পর্শ করে, সেই সহজ অবস্থায় দর্শন, শ্রবণ, স্পর্শ সকলই যথার্থ ও অকৃত্রিম।—(পৃঃ ২৩৩)

সেবকের নিবেদন—চতুর্থ খণ্ড।

স্বর্গীয় উদ্বাহ—

চক্ষু দেখে কেন? ভবিষ্যতে আত্মা দেখিবে, এই জন্য। শরীরের চক্ষু সৃষ্টির সৌন্দর্য্য দেখিয়া বিমোহিত হয়; আত্মার উজ্জ্বল বিশ্বাস-চক্ষু স্রষ্টার অরূপ রূপ দেখিয়া বিমুগ্ধ হয়। কর্ণ শুনে কেন? ভবিষ্যতে আত্মার বিবেককর্ণ ঈশ্বরের আদেশ শুনিবে, এই জন্য। হস্ত ধরে কেন? ইহার গূঢ় অর্থ এই যে, যখন বাহিরে দুটি হাত অবসন্ন হইয়া পড়িবে, তখন আত্মার ভিতর হইতে ভক্তি-হস্ত বাহির হইয়া ব্রহ্মচন্দ্র ধারণ করিবে। পা চলে কেন? পশুও চলে। মনুষ্যের শরীরে দুটী চরণ সংলগ্ন হইল কেন? অবশ্যই ইহার কোন গূঢ়তর অর্থ আছে। শরীরে যেমন গতি-শক্তি দিয়াছেন, বিধাতা আত্মার মধ্যেও গতি-শক্তি নিহিত রাখিয়াছেন; সেই গতি-শক্তি দ্বারা আত্মা সতেজে "থাক্‌ব না আর এ পাপ-রাজ্যে, ব্রহ্মলোকে যাব চলে" এই কথা বলিতে বলিতে দুর্দ্দশা ও অন্ধকারের রাজ্য ছাড়িয়া দিব্যধামে চলিয়া যাইবে।—(পৃঃ ১৩)

বাস্তবিক স্বর্গপতি, সর্ব্বপতি, বিশ্বপতি, প্রাণপতি ঈশ্বরের সঙ্গে গূঢ় প্রাণগত যোগ স্থাপিত না হইলে, জীবাত্মা কিছুতেই প্রকৃত সুখ শান্তি লাভ করিতে পারে না।—(পৃঃ ২০)

তাঁহার মত প্রাণের সুহৃদ্ ও সর্ব্বসুখদাতা আর কেহ নাই, তিনিই পূর্ণ সুখ।—(পৃঃ ২০)

* * * * *

কর্ম্ম-যোগ—

তুমি তোমার কার্য্য শেষ না করিয়া ইহলোক হইতে পরলোকে যাইতে পার না।—(পৃঃ ১১৮)

কার্য্য না করিয়া ইহলোক হইতে পলায়ন করিলে দুর্নাম হইবে, পরলোকে কষ্ট সহ্য করিতে হইবে। যদি কার্য্য করিয়া চলিয়া যাও, বিশেষ পুরস্কার লাভ করিবে।—(পৃঃ ১১৯)

পৃথিবীতে ঈশ্বরের কার্য্য শেষ না হইলে পরলোকের দ্বার অবরুদ্ধ হইবে, সুতরাং সাবধান হইয়া ইহলোকে কার্য্য শেষ করিতে হইবে। —(পৃঃ ১১৯)

কার্য্য শেষ করিয়া গেলে স্বর্গের দ্বার আপনি খুলিবে।—(পৃঃ ১২৮)

* * * * *

লক্ষ্মী ও সরস্বতীর মিলন—

ধন সম্পদ শান্তি সুখ স্বচ্ছন্দতা সকলই আমাদের তাঁহার নিকটে। —(পৃঃ ১৫৫)

* * * * *

ভাই অঘোরনাথ—

মৃত্যুকে দেখিয়া মূর্খেরাই বিকম্পিত হয়, ভীত হয়। কিন্তু ভয়ানক মৃত্যুই পরিত্রাণের সেতু। ঈশ্বরের সুন্দর মুখ দেখিলে লোভ

হয়, অন্ধকার মৃত্যু দেখিলে লোকে ভয় পায়, কিন্তু অন্ধকার আমাদিগের উপকারী।—(পৃঃ ১৫৭)

দুঃখ পাইয়া মানুষ যোগী হয়, মানহানি, ধনহানি, সন্তানহানি হইলে আরও যোগী হয়।—(পৃঃ ১৫৮)

এক হাতে সুখ, এক হাতে দুঃখ ধারণ করিব। সুখ দুঃখ দুই মার কাছে লইয়া যায়। দক্ষিণ হস্ত ধরিল জীবন ও সুখ, মৃত্যু ও শোক বাম হস্ত ধরিল। ইহারা টানিয়া মার কাছে লইয়া চলিল। এক হস্ত উৎসুক হইয়া সুখের বস্তু ধরিল, আর এক হাত রোগ শোক কলহ বিবাদ প্রভৃতি পৃথিবীর দুঃখ ধরিল।—(পৃঃ ১৫৮)

সুখে আমোদিত হইয়াও মাকে মনে পড়ে, দুঃখে কাঁদিতে কাঁদিতেও মাকে মনে পড়ে।—(পৃঃ ১৫৮)

* * * * *

সৎসঙ্গ—

মৃত ব্যক্তির সঙ্গে সদালাপ সৎপ্রসঙ্গ প্রয়োজন। সকল ভাই পৃথিবীতে রহিল, এখন আর বাহ্যিক আকার দেখিবার সম্ভাবনা নাই। এখন সৎপ্রসঙ্গে জীবিতগণ মৃতের দলভুক্ত। যিনি ইহলোকে রহিলেন না, তিনি আমাদের দলভুক্ত হইয়া রহিলেন।—(পৃঃ ১৭০)

আমাদিগের একজন পরলোকে যাওয়াতে ইহলোক পরলোক এক হইল, সাধুগণের সঙ্গে আমাদিগের সম্বন্ধ স্থায়ী হইল, এই নূতন সম্বন্ধ জন্য নূতন কর্ত্তব্য উপস্থিত হইল। পরলোকে সকলে বন্ধুকে সমাদরে গ্রহণ করিয়াছেন। এখন সকল প্রকারের পত্র পৃথিবীর ডাকে আর পাঠাইতে হইবে না। এখন আমাদিগের পত্র সহজে স্বর্গে পাঠাইতে পারিব। আমাদিগের বন্ধুর মধ্য দিয়া স্বর্গে যাইবে।

আমাদিগের মধ্যে এক নূতন বিধান খুলিল। এক পার্থিব সম্বন্ধ ছিল, এখন ইহলোক পরলোকের সম্বন্ধ খুলিল। ইহলোকের ভদ্রতাই আর শেষ নয়, কত সৎপ্রসঙ্গ সদালাপ পরলোকের সাধুগণের সঙ্গে হইবে।—(পৃঃ ১৭০)

পরলোকের সম্বন্ধ আধ্যাত্মিক। আত্মার ভিতর দিয়া পরলোকের বিষয় দেখিতে হইবে। বাহিরের চক্ষে পরলোকের সাধুগণকে দর্শন কুসংস্কার, বাহিরের হস্তে যে তাঁহাদিগকে ধরিতে যায়, সে পাগল। পৃথিবীর প্রণালীতে তাঁহাদিগকে ধরিতে গেলে অপরাধী হইতে হয়; তাঁহারা তদ্দ্বারা অপমানিত হন।—(পৃঃ ১৭১)

পৃথিবী ও স্বর্গ এ দুইয়ের ভিতরে সেতু নির্ম্মাণ করিতে হইবে, ভিতরের পথ দিয়া করিতে হইবে, তথায় যাইতে হইলে মনের ভিতর দিয়া রাস্তা। সেখানে বাহির দিয়া যাইবার যো নাই।—(পৃঃ ১৭২)

মন বিশুদ্ধ কর, পরলোকের বিশ্বাস উজ্জ্বল কর, ঈশ্বরের ভক্তিতে উন্নত হও, ব্যাকুল-হৃদয়ে মনের ভিতরে প্রার্থনা কর, ঈশ্বর তোমার বন্ধুকে দেখাইবেন, তোমার বন্ধুকে তুমি ঈশ্বরের ক্রোড়ে দেখিতে পাইবে।—(পৃঃ ১৭৩)

তাঁহাদিগকে হৃদয়ে রাখিয়া সৎপ্রসঙ্গ কর। ঠিক যেমন মনুষ্যের সঙ্গে সৎপ্রসঙ্গ করিয়া থাক, তেমনি করিতে হইবে। এখান হইতে তাঁহারা চলিয়া গিয়াছেন বলিয়া তাঁহাদিগের সঙ্গে সম্বন্ধ চলিয়া গিয়াছে, এরূপ মনে করিও না। পার্থিব সম্বন্ধ তাঁহাদিগের সঙ্গে চলিয়া গিয়াছে, এখন আর তাঁহাদিগের সঙ্গে মিলন হইতে পারে না, স্বর্গে গিয়া তবে তাঁহাদিগের সঙ্গে সম্মিলন হইবে, এরূপ মনে করিও না। সংসারের পরপারে গিয়া পৃথিবীর পিতা আরও নিকট হইলেন, বন্ধুর বন্ধুতা আরও নিকট হইল, প্রত্যেক সাধুর সঙ্গে আমাদিগের আরও

নিকট সম্বন্ধ হইল। মরিলেই সম্বন্ধ গেল, ইহা হইতে পারে না। এখানে জীবন থাকিতে এক শ্রেণীভুক্ত, চলিয়া গেলে অপর শ্রেণীভুক্ত, ইহা মনে করিতে পার না। এক সময়ে যাঁহাকে দেখিয়াছি, সর্ব্বদা দেখিব।—(পৃঃ ১৭৪)

পাঁচ জনের সঙ্গে যেমন সম্বন্ধ ছিল তেমনই রহিল, মরিয়াছেন বলিয়া তিনি অগ্রাহ্য হইলেন, আজ শ্রাদ্ধ কর্ম্ম করিয়া সমুদয় সম্বন্ধ শেষ হইল, এরূপ কখন মনে করিব না। শ্রাদ্ধে পার্থিব সম্বন্ধ শেষ হইল বলিয়া স্বর্গীয় সম্বন্ধের শেষ হইল, তাহা নহে। শ্রাদ্ধে পার্থিব সম্বন্ধের শেষ, স্বর্গীয় সম্বন্ধের আরম্ভ। আজ যাঁহার শ্রাদ্ধ করিলাম, স্বর্গে তিনি জীবিত হইলেন, এই কথা ভাবিব। এখন সম্বন্ধ পূর্ব্বাপেক্ষা আরও স্পষ্টতর।—(পৃঃ ১৭৪)

স্বর্গের বন্ধু আপনি কি আমাদিগের হইতে পারেন? কখনই না। হাতে ধরিয়া ঈশ্বর স্বর্গের বন্ধুকে আনিয়া মিলিত করেন।—(পৃঃ ১৭৫)

সেবকের নিবেদন—পঞ্চম খণ্ড।

মুক্ত অবস্থা—

পিতা মাতার নিকট জন্মগ্রহণ করিয়া যেমন পৃথিবীতে আসিয়াছি, তেমনই স্বর্গস্থ পিতার নিকটে জন্ম লইয়া স্বর্গে আসিব। দুই চক্ষু দুই কর্ণ লইয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া সংসারক্রিয়া সাধন করিতেছি; এইরূপে বিশ্বাস ভক্তি, পুণ্য আনন্দ লইয়া, জ্ঞানচক্ষু বিবেককর্ণ লইয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া, ভূমি পরিত্যাগ করিয়া, স্বর্গে আরোহণ করিয়া, স্বর্গক্রিয়া সমাধা করিব।—(পৃঃ ২০)

*　　*　　*　　*　　*

ব্রহ্মতেজ—

ব্রহ্মবলের তেজ যেখানে, সেখানে কালের কোন ক্ষমতা নাই। ব্রহ্মতেজে যিনি তেজস্বী, তিনি মৃত্যুশয্যায় বলেন, "শমন, আমি তোমার ধার ধারি না, আমার উপরে তোমার কোন অধিকার নাই। মৃত্যুঞ্জয় ঈশ্বর আমার মন্ত্রদাতা, দীক্ষাদাতা গুরু; মৃত্যু, তুমি আমার কি করিবে? আমি তোমার দ্বারা কখনই পরাস্ত হইব না"।—(পৃঃ ৬১)

শরীর ক্ষয় হউক না কেন, শরীর যখন নষ্ট হয়, তখনই তো আত্মা স্ফূর্ত্তি প্রকাশ করে। পিঞ্জর ছাড়িয়া যখন পাখী উড়ে, তখনই তো ডানার অধিক বল প্রকাশিত হয়।—(পৃঃ ৬১)

উপাসনাই উৎসাহের আকর। এই উপাসনা দ্বারা আমাদের আত্মা স্বর্গলোক, পরলোকের জন্য উপযুক্ত হউক।—(পৃঃ ৬২)

* * * *

ব্রহ্মপ্রেম চির-সরস—

ব্রহ্মপদ-সংস্পর্শে বহুকালের দগ্ধ প্রাণ শীতল হইয়াছে।—(পৃঃ ৬৮)

* * * * *

পূর্ণ ধর্ম্ম ভবিষ্যতে—

আকাশে এমন সকল নক্ষত্র আছে, যাহাদের জ্যোতি পৃথিবীতে এখন পর্য্যন্ত আসে নাই। সেইরূপ স্বর্গে এমন সকল সত্য গোপনে রহিয়াছে, পৃথিবী এখন পর্য্যন্ত যাহার আভাস পায় নাই।—(পৃঃ ৮২)

* * * * *

ব্রহ্মদর্শন ও শ্রবণ স্বাভাবিক—

জলে নামিলেই যেমন তাহাতে মগ্ন হওয়া যায়, পক্ষী যেমন অনা-

শ্বাসে উপরে উঠে, আত্মার ব্রহ্মে নিমগ্ন হওয়া, মানসপক্ষীর ঊর্দ্ধে উঠা তেমনই সহজ।—(পৃঃ ১০৫)

* * * * *

অনিত্যের মধ্যে নিত্য—

মৃত্যুঞ্জয়ের মন্দিরের বাহিরে বৎসর চলিয়া যায়, কালের পরিবর্ত্তন হয় এবং সমস্ত আন্দোলিত হয়; কিন্তু মহাদেবের মন্দিরের ভিতরে কাল প্রবেশ করিতে পারে না।—(পৃঃ ১৩১)

চল আমরা সকলে ব্রহ্মের বুকের ভিতরে যাই। যেখানে কাল অথবা মৃত্যুর অধিকার নাই।—(পৃঃ ১৩১)

আমরা যাঁহার ক্রোড়ে আশ্রিত, তিনি কালাতীত ব্রহ্ম মৃত্যুঞ্জয়। তাঁহার পদতলে ঘর করিলে মৃত্যুযন্ত্রণা থাকে না। অতএব যেমন বৎসর কাল-সমুদ্রে মিশিয়া গেল, সেইরূপ প্রত্যেক ক্ষুদ্র জীবাত্মা ঢেউ অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডপতি পরমাত্মার মধ্যে সম্মিলিত হইয়া যাক।—(পৃঃ ১৩৩)

সঙ্গত।

আত্ম-পরীক্ষা—

সংসারের কোলাহল মধ্যে অন্তর্দৃষ্টি জাগ্রৎ রাখা অত্যন্ত আবশ্যক।—(পৃঃ ৩)

* * * * *

সময়—

যিনি সর্ব্বদা এলোক হইতে অপসৃত হইতে প্রস্তুত রহিয়াছেন, তিনিই উত্তমরূপে সময় ক্ষেপণ করিতেছেন।—(পৃঃ ৭)

সর্ব্বদা কর্ত্তব্য-জ্ঞানকে জাগ্রৎ রাখিবে ও মধ্যে মধ্যে মৃত্যুকে স্মরণ করিবে।—(পৃঃ ৭)

*   *   *   *   *

নির্ভর—

অতএব যাহাতে আত্মা নিজবলে ঈশ্বরের দিকে গমন করিতে পারে, সেইরূপ চেষ্টা করিবে।—(পৃঃ ৮)

*   *   *   *   *

সংসার—

যেমন শরীর মৃত হইলে বাহ্য বিষয়েতে অসাড় হইয়া পড়ে, তদ্রূপ সাংসারিক জীবন অতিক্রম করিলে সংসারের সুখ দুঃখে, সম্পদ বিপদে, আশা ভয়ে, আত্মা আর বিচলিত হয় না।—(পৃঃ ১৩)

*   *   *   *   *

পবিত্রতা—

আত্মাকে পবিত্র করাই আমাদের সমুদয় কার্য্যের লক্ষ্য থাকিবে। কর্ম্ম দ্বারা পাপ পুণ্য আত্মা হইতেই জন্মে, আত্মা সকল কর্ম্মের মূল। অতএব আত্মার প্রতি সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখিবে।—(পৃঃ ১৭)

*   *   *   *   *

ধর্ম্মপথে নিরাশা—

কতকগুলি পরীক্ষাতে হৃদয় আন্দোলিত হইলে নিরাশা উপস্থিত হয়। ইহার জন্য অগ্রে হৃদয়কে প্রস্তুত না রাখিলে অত্যন্ত বিপদ। মনে যদি একটু সংশয় কি নিরাশার ভাব থাকে, পরীক্ষার সময় তাহা দৃঢ়তররূপে বদ্ধমূল হয়। নিরাশা প্রমাণ দেখাইয়া অবিশ্বাসী হৃদয়কে বলে দেয়, "তোর আর আশা নাই, তুই আর জীবনকে এরূপ উপহাসের বিষয় করিস্ না, ধর্ম্ম মিথ্যা, ঈশ্বর মিথ্যা, সকলই মিথ্যা।"

ধর্ম্ম যেমন প্রমাণ দেখাইয়া বিশ্বাস দৃঢ় করেন, অধর্ম্ম তেমনই অবিশ্বাস প্রবল করিয়া দেয়। যাহারা অবিশ্বাসী, তাহারা মরিবে প্রতিজ্ঞা করে। তাহারা মনে করে, "এ অবস্থা নিরুপায়, অসহায় অবস্থা। যিনি বলিয়াছিলেন, আমি পরম পিতা, তিনিও পরিত্যাগ করেন। বুঝিয়াছি, বিপদ্‌কালে তিনিও শুনেন না, বিষয়ী বন্ধুর ন্যায় অকূল পাথারে ভাসাইয়া পলায়ন করেন। তিনি যদি দয়াময় হন, তবে কি এমন হয়? তবে তিনি দয়াময় নন। তাঁহারও মনুষ্যের ন্যায় স্নেহ দয়া ও সহিষ্ণুতার সীমা আছে। দুই বৎসর নয়, পাঁচ বৎসর দয়া করিলেন, কিন্তু চিরকাল কি করিতে পারেন?" কিন্তু ভক্ত সাধকের ভাব ইহার বিপরীত। তিনি বলেন, ঈশ্বর কখনই পরিত্যাগ করেন না, করিতে পারেন না। তিনি কখন চরণের আশ্রয় দেন, কখন পদাঘাত করেন; কখন মিষ্টান্ন, কখন তিক্ত বস্তু দেন; কখন সূর্য্য, কখন অন্ধকার দেখান; কখন বিপদ, কখন সম্পদ প্রেরণ করেন। তিনি বলেন, ঈশ্বর মারিতেছেন মারুন, কিন্তু তাহাতে আমার ভয় নাই। কেন না আমি লক্ষণ মিলাইয়া দেখিয়াছি, তাঁহার যে চরণ এক সময় আশ্রয় দিয়াছে, সেই চরণই আঘাত করিতেছে। তিনি আমার মঙ্গলের জন্য আমাকে পরীক্ষাতে ফেলিয়া কষ্ট দিতেছেন, ইহাতে আমার চৈতন্য হইবে। তিনি অন্ধকারের পর আলোক, বিপদের পর সম্পদ আনিবেন, কেন না উভয়ই তাঁহার প্রেরিত।—(পৃঃ ৪৭)

* * * * *

ভয় ধর্ম্মের আরম্ভ, প্রেম ধর্ম্মের শেষ—

আমাদিগের মধ্যে ঈশ্বর-তত্ত্বের যত কথা হয়, পরলোক সম্বন্ধে তত হয় না, এতদ্দ্বারা ভবিষ্যতে একটি বিশেষ ক্ষতি হইবে। বিলাতে

এইরূপ ঘটিয়াছে যে, দৃঢ় একেশ্বরবিশ্বাসীদিগের মধ্যেও, অনেকে পরকাল বিষয়ে কেবল অনুমান করেন; ঈশ্বরে যেরূপ দৃঢ় বিশ্বাস আছে, পরলোকে তেমন নয়। তাঁহারা কোন নূতন ধর্ম্মের ভিত্তি স্বরূপে কেবল একেশ্বরে বিশ্বাস রাখিতে চান, পরলোক সম্বন্ধে কোন কথা তাহার মধ্যে আনিতে ভালবাসেন না। আমাদিগের মধ্যেও ঈশ্বর সম্বন্ধে যেরূপ, পরকাল সম্বন্ধে সেরূপ সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ জ্ঞান নাই। তজ্জন্য মৃত্যুর কথা তত ঘটে না। হিন্দুদিগের মধ্যে যে প্রকার শ্মশান-বৈরাগ্য আছে, সেরূপ আমাদের মধ্যে নাই, কিন্তু কেবল তাহা থাকিলেও চলিবে না; পরলোকের গম্ভীর ভাব, উজ্জ্বল সত্তা এবং অনন্ত উন্নতির শক্তি থাকা উচিত। কেবল ভয় দ্বারা অধিক বয়সের লোকদিগকে অধিককাল শাসন করা যায় না, সংসারের জীবন অস্থায়ী, কেবল ইহা বলিলে চলে না। কোন এক বিষয়ে ভাব এবং অভাব উভয় পক্ষে বলা উচিত।—(পৃঃ ৭৬)

যথার্থ বৈরাগ্যই ঈশ্বরে অনুরাগ। মৃত্যুভয় দ্বারা হৃদয়কে ঈশ্বরের দিকে, পবিত্রতার দিকে আনয়ন করে, কিন্তু ভক্তি—এখন যে পবিত্রতায় আছি, তাহা অপেক্ষা অধিকতর পবিত্রতায় থাকিবার আশা দিয়া—পরলোকে বিশ্বাস দৃঢ় করিয়া দেয়। সংসারের অনিত্যতা স্মরণ করার নাম বৈরাগ্য।—(পৃঃ ৭৭)

* * * * *

আকস্মিক মৃত্যু ঘটনা হইতে শিক্ষা—

মৃত ব্যক্তিদের আর জাতি বর্ণ ধর্ম্মভেদ নাই, সকলেই এক পিতার সন্তান হইয়া তাঁহার পরিবারস্থ হন।—(পৃঃ ১১৮)

* * * * *

মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হওয়া—

মৃত্যুর অর্থ যদি পরলোকের অবস্থা হয়, তাহার আর এক নাম ঈশ্বরের সহিত বাস করা।—(পৃঃ ১১৯)

পরলোকের দিকে সকলেই চলিতেছে, জলস্রোতের বিরাম নাই। পাপী তাপী, সাধু অসাধু, যিনি যে অবস্থায় থাকুন, সেই অবস্থাতেই যাত্রা করিতেছেন।—(পৃঃ ১১৯)

একজন আফিসের হিসাব না মিলাইয়া যদি ঘরে চলিয়া যান এবং পরদিন তাঁহার কর্ম্ম যায়, তিনি প্রভুর নিকট যেমন দায়ী ও দণ্ডভাজন হন, জীবনের কাজ না সারিয়া পরলোকে গেলেও সেইরূপ অবস্থা।—(পৃঃ ১২০)

এ পৃথিবীতে যেমন একবার পাপ হইতে মুক্ত হইয়া আবার পতন হইয়া থাকে, পরলোকে সেইরূপ নহে। তাহা হইলে অনন্তকাল পতন ও উত্থান করিতে হয়। ইহলোকে আমাদিগের সঙ্গে সঙ্গে চিরকাল প্রলোভন ও পরীক্ষা চলিয়া থাকে, পরলোকে সেরূপ নয়। সেখানে বাহিরে কোন প্রলোভন নাই, সেখানকার পরীক্ষা মনের মধ্যে। মনের মধ্যে পাপ সংগ্রহ করিয়া লইয়া যাই, সেই পাপই উন্নতির পথে বাধক হয়। মূল সত্য এই, আমি শরীর ফেলিয়া মন লইয়া যাইতেছি, পরলোকে নিজের আধ্যাত্মিক অবস্থানুসারে উন্নতি লাভ করিব।—(পৃঃ ১২০)

মৃত্যু কেবল লোকান্তর মাত্র, অবস্থান্তর নহে। আত্মা এক স্থানে ছিল, আর এক স্থানে যাইবে, কিন্তু এখানে যে অবস্থায় মৃত্যু, মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই সে অবস্থার পরিবর্ত্তন হইবে না। মৃত্যুর পরে যে অজ্ঞান অবস্থা, তাহা থাকিবে এরূপ নহে। শারীরিক বিকারে জ্ঞান কিয়ৎকাল মেঘাচ্ছন্ন সূর্য্যের ন্যায় আচ্ছন্ন থাকিতে

পারে, কিন্তু পরে প্রকাশিত হইবে। নিদ্রার অবস্থাতে জ্ঞান বুদ্ধি যেমন প্রচ্ছন্ন থাকে, মৃত্যুকালে মোহও সেইরূপ। শরীর ও মন যতকাল সম্বদ্ধ আছে, ততকাল কিয়ৎ পরিমাণে পরস্পরে পরস্পরের অধীন। অত্যন্ত বিকারী রোগী যখন রোগমুক্ত হইয়া পুনরায় পূর্ব্ব জ্ঞান লাভ করে, তখন যেমন সে জ্ঞানে, বিকার-কালীন অজ্ঞানতার কোন দাগ থাকে না, মৃত্যুর পর আত্মার জ্ঞানও সেইরূপ বিশুদ্ধ ভাবে প্রকাশিত হয়।—(পৃঃ ১২০)

মন আপনি আপনার স্বর্গ ও আপনি আপনার নরক। ইহলোকে যাহা পৃথিবী, পরলোকে তাহা মন। সেখানে মনের মধ্যেই আহার নিদ্রা, মনের মধ্যেই পরিশ্রম বিশ্রাম, মনের মধ্যেই আনন্দ ও বিষাদ। উপাসনা কালে গভীর ধ্যানে মগ্ন হইয়া, শরীরকে এককালে ভুলিয়া গেলে যে অবস্থা হয়, তাহাই পরলোকে সাধুদিগের অবস্থার আভাস। —(পৃঃ ১২১)

* * * * *

ঈশ্বর ও পরকাল সাধন—

ঈশ্বর ও পরলোক সাধন পরস্পরের সহকারী। আত্মার বাস-স্থান পরকাল, উহা ঈশ্বরে।—(পৃঃ ১২৬)

ঈশ্বরে অনন্তকাল বাস করিতেছি, তাঁহার মধ্যে ইহকাল ও পর-কাল গ্রথিত রহিয়াছে। ইহকাল ইহার অতি ক্ষুদ্র অংশ, তাহার পর পরকাল। মৃত্যু কিছুই নয়, একটী ঘটনা মাত্র।—(পৃঃ ১২৬)

পরলোক হইতে ইহলোককে স্বতন্ত্র করিয়া ভাবিতে পারা ভয়ানক অবস্থা, কেন না তাহাতে ঈশ্বর ও পরকাল দুই স্বতন্ত্র থাকে ও ভাবিয়া ভাবিয়া স্থির করিতে হয়। সাধন-চশমা পারিলে ঈশ্বর ও পরকাল একত্রে অতি উজ্জ্বলবেশে প্রকাশ পায়।—(পৃঃ ১২৭)

* * * * *

দ্বাচত্বারিংশ সাম্বৎসরিক উৎসব—

আত্মা যতক্ষণ ঈশ্বরের সহবাসে থাকে, ততক্ষণই তাহার সরস এবং সজীব অবস্থা।—(পৃঃ ১৩৫)

পুষ্পের জীবন জল, আত্মার জীবন ব্রহ্ম-প্রেম। ব্রহ্ম হইতে যাই আত্মা বিচ্ছিন্ন হইল, তখনই তাহা শুষ্ক হইল। পুষ্পের এমন শক্তি নাই যে রৌদ্রের মধ্যে থাকিলেও আপনার বলে রস উৎপাদন করে, সেইরূপ আত্মারও এমন কোন ক্ষমতা নাই যে ব্রহ্ম হইতে দূরে থাকিয়াও আপনার বলে সরস থাকিতে পারে।—(পৃঃ ১৩৫)

*　　*　　*　　*　　*

উৎসবলব্ধ আশা—

বিপদ যদি ঈশ্বর-লাভের উপায় হয়, সেই বিপদই প্রকৃত সম্পদ। —(পৃঃ ১৪৭)

*　　*　　*　　*　　*

কর্ম্মযোগ—

বিবেক আমাদের মধ্যে থাকে, অথচ আমাদের অতীত—স্বর্গীয়। আত্মার কর্ণে আদেশ শুনাইবার জন্য ইহাকে ঈশ্বরের মুখ বলা যায়। —(পৃঃ ১৬৮)

*　　*　　*　　*　　*

আশ্রম স্থাপনের উদ্দেশ্য—

চক্ষু চাহিয়া যে কিছু সম্বন্ধ স্থির করা যায়, তাহা কালে পুরাতন ও অবস্থা গতিকে বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়, কিন্তু নিমীলিত নেত্রে কেবল আত্মার যোগে যে পরিবার সাধন হয়, তাহা স্থায়ী ও দুশ্ছেদ্য।—(পৃঃ ১৯৪)

*　　*　　*　　*　　*

মহাপুরুষগণের সঙ্গে যোগ—

ইহলোক ও পরলোক এক, কেন না আমাদিগের জীবন এক ভিন্ন দুই নহে। এখানে যে জীবনের আরম্ভ, সেই জীবনই অনন্ত-কাল পর্য্যন্ত প্রসারিত হইতে থাকিবে। মৃত্যু কিছুই নহে, কেবল একটা ঘটনা মাত্র। ইহা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে মৃত ও জীবিত সকলেই এক হইল, কারণ যাঁহারা মৃত, তাঁহারা তো জীবিত রহিয়াছেন। দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে যাঁহারা মৃত, আর পরশ্ব যাঁহারা মৃত, সকলেই সমান ভাবে বর্ত্তমান। তাঁহারা কোথায় আছেন? নিশ্চয়ই ঈশ্বরের কাছে। তবে উপাসনা দ্বারা আমি ঈশ্বরের নিকটস্থ হইলে তাঁহাদেরও নিকটস্থ হই। ঈশ্বরকে অবলম্বন করিয়া, তাঁহাদের সহিত সম্মিলিত হইয়া থাকিব, তাহাতে আর অসম্ভব কি?—(পৃঃ ২২৪)

প্রশ্ন।—পরলোকস্থ ব্যক্তিদিগের সহিত এক পরিবার হওয়া কিরূপ?

উত্তর।—এক পরিবার কি, না এক বাড়ীতে প্রীতিযোগে একত্র বাস করা। নিকটস্থ দূরস্থ, ইহলোকের পরলোকের সকল লোকই ঈশ্বরের মধ্যে বাস করিতেছেন, তাঁহা ছাড়া কাহার থাকিবার যো নাই। তাঁর মধ্যে প্রবেশ করিলেই আমরা সকলকে পাই।—(পৃঃ ২২৪)

ধর্ম্মজীবনের উন্নতির ধাপ আছে। আমি যদি চারি ধাপ উঠি, পরলোকগত যে ব্যক্তি উন্নতিতে আমার সঙ্গে সমান, তাঁহার সহিত আমার যোগ দৃঢ় হয়। যাঁহারা অধিক উন্নত ধাপে, তাঁহাদের সঙ্গে যোগ করিতে হইলে আত্মাকে অধিক উন্নত করিতে হইবে। ধর্ম্ম-জীবনের শ্রেণী বিভাগও আছে। অধিক বিশ্বাসী, অধিক প্রেমিক,

অধিক স্বাধীনতাপ্রিয় ব্যক্তিরা পরস্পরে এক শ্রেণীস্থ হন। আত্মায় আত্মায় গূঢ় আকর্ষণ আছে, আপনার ভাবের লোককে টানিয়া লয়। (পৃঃ ২২৫)

শরীরের যোগ কিছুমাত্র আবশ্যক নয়, আধ্যাত্মিক যোগে স্থায়ী ও প্রকৃত প্রণয় হইতে পারে।—(পৃঃ ২২৫)

জীবিত ব্যক্তিদিগের পক্ষে যাহা সম্ভব, মৃত ব্যক্তিদিগের পক্ষে তাহা কেন সম্ভব হইবে না ?—(পৃঃ ২২৬)

আত্মায় আত্মায় এক ভাব হইলেই মিলিবে।—(পৃঃ ২২৭)

* * * * *

পরলোক—

আমাদের ইহলোক পরলোক এক সূত্রে গ্রথিত এবং পরলোকের আরম্ভ এখানেই। এ জীবনে যাহার আস্বাদন পাই, পরজীবনে তাহা পাইব, নিশ্চয় বলিতে পারি।—(পৃঃ ২৩০)

ব্রাহ্ম জানেন, পরলোকের আশা ইহলোকে নিশ্চয়ই কতক পরিমাণে চরিতার্থ হইয়াছে, পরলোকে তাহা ক্রমশঃ পূর্ণ হইতে থাকিবে। —(পৃঃ ২৩০)

ইহলোক ও পরলোক এক। মৃত্যু এ ঘর হইতে ও ঘরে যাওয়া মাত্র।—(পৃঃ ২৩২)

ঈশ্বরে বিশ্বাস অর্থই পরলোকে বিশ্বাস। গভীর উপাসনায় নিমগ্ন হইয়া যখন ঈশ্বরকে আত্মার একমাত্র অবলম্বন জানিয়া তাঁহার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করি, তখন বিষয়, সংসার ও এ পৃথিবীর অতীত এক স্বতন্ত্র স্থানে আমরা বাস করি। তখন এই মাত্র জানি, তাঁহাতে বাঁচিয়া আছি, চিরকাল থাকিব।—(পৃঃ ২৩২)

* * * * *

নববিধানের গূঢ়তত্ত্ব—

জীবাত্মার উদ্দেশ্য কেবল ব্রহ্মবান্ হওয়া, সে ধার্ম্মিক কি সুখী হইতে চাহিবে না।—(পৃঃ ৩০০)

* * * * *

প্রকৃত বিশ্বাস—

কেবল সংসারের বিপদ আপদ শান্তির জন্য যে ধর্ম্ম, তাহা স্বার্থপর ও ক্ষণিক, তাহা নিরাপদ ও স্থায়ী হইতে পারে না। ঈশ্বরের জন্য যে নিঃস্বার্থ ও উন্নত ধর্ম্ম, তাহাতেই মুক্তি ও পরিত্রাণ লাভ হয়।—(পৃঃ ৩২০)

ব্রাহ্মিকাদিগের প্রতি উপদেশ।

পরলোক—

পরকালই আমাদের যথার্থ গৃহ, এই পৃথিবী আমাদের থাকিবার স্থান নহে। ঐ সাম্‌নে একটী জায়গা আছে, তাহা অত্যন্ত সুন্দর। দূর থেকে ঝাপ্‌সা দেখিবে। যদি সহজ এবং স্বাভাবিক মন হয়, উহা দেখিলে নিরাশের আশা হইবে ; দুঃখ ভুলিয়া যাইবে। ঐস্থানে এমন ভাল ভাল ভাই এবং এমন ভাল ভাল ভগ্নী আছেন, তাঁহাদের সঙ্গে গিয়া মিশিব। তাঁহাদের ন্যায় ভক্তিভাবে দয়াল নাম গান করিব।—(পৃঃ ৪৮)

যেমন অন্ধকারে পাইলে পিতাকে, তেমনি অন্ধকার বিপদের মধ্যে পাইলে একটী ঘর।—(পৃঃ ৪৮)

* * * * *

পরলোক মনোহর—

আমাদের ঈশ্বর এবং বাড়ী দুই নিরাকার।—(পৃঃ ৪৯)

সেই যে অন্ধকার মধ্যে নিরাকার ঈশ্বর আছেন, তাঁহাকে যেমন ভালবাসা যায়, সেইরূপ অন্ধকার মধ্যে যে পরলোকরূপ ঘর আছে, উহার প্রতিও ভালবাসা হয়। মৃত্যুভয়ে ভীত হইলে পরলোক দেখা যায়।—(পৃঃ ৫০)

সেই পরলোকরূপ বাড়ীতে এমন সকল উপাসনার জায়গা আছে, যাহা তোমরা কল্পনাতেও ভাব নাই। আর সেখানে উপাসনার আয়োজনই বা কত। রাশি রাশি স্তব স্তুতি, কত সঙ্গীত, কত প্রার্থনা সেই বাড়ীর চারিদিকে টাঙ্গান আছে, সেই বাড়ীর ভক্তগণের কত আহ্লাদ, কত উল্লাস। সেই জন্য বলি, ঐ বাড়ী বড় মনোহর। ঐ বাড়ীর ছবি বুকের উপরে রাখিলে প্রাণ জুড়ায়। উহার বাহ্যিক রঙ্গে নহে, কিন্তু উহার মধ্যে যে প্রেমসিন্ধু হইতে দক্ষিণের বাতাস এবং শান্তির নির্ম্মল জলের স্রোত বহিতেছে, তাহাতেই হৃদয় শীতল হয়। ব্রহ্মের শ্রীপদ হইতে গঙ্গা বাহির হইতেছে, সেই নদীতে ভক্তেরা স্নান করিতেছেন। সেই পুণ্যের জল, সেই প্রেমের জল এমন মিষ্ট যে, সেরূপ আর কোথাও পাওয়া যায় না। প্রেমের ছবি, পুণ্যের ছবি দেখিলে কত আহ্লাদ হয়। যথার্থ পুণ্যের নিকেতন, প্রেমের বাড়ী, সেখানে কত পবিত্রতা, কত প্রেম, কত আহ্লাদ, আত্মার পুষ্টির জন্য সেখানে কত চাউল, কত দাল রাহিয়াছে! এক দিনও ভাবিতে হইবে না, আজ কি খাইব। এমন বাড়ীর কথা বলিলে নিশ্চয়ই আহ্লাদ হয়। ঈশ্বর যথার্থ ই স্নেহময় পিতা। তিনি এই পৃথিবীতে আমাদিগকে কত সুখ দিতেছেন। আবার পৃথিবী ছেড়ে যখন চলে যাব, ভাল বাড়ীতে নিয়ে রাখিবেন।—(পৃঃ ৫১)

আমাদের ঈশ্বর কোথায়? এখানেও আছেন, পরলোকেও আছেন।—(পৃঃ ৫২)

সাধন করিতে করিতে পরলোকে যাওয়া যায়। আমরা যাই, তোমরাও যাইতে পার। একবার যখন খুব ভক্তিভাবে ঈশ্বরের কাছে বসা যায়, তখন সেই লোকের ঘর নিকটে অনুভব করা যায়। —(পৃঃ ৫২)

ঈশ্বর যদি সত্য হন, তবে পরলোকও সত্য।—(পৃঃ ৫৩)

* * * * *

কন্যার প্রতি আহ্বান—

তিনি বলিতেছেন, যখন আর কেহই সঙ্গে থাকিবে না, সেই মৃত্যু-কালে এবং পরলোকে অনন্তকাল তিনি তোমার কাছে থাকিবেন।—(পৃঃ ৭০)

এখন যিনি তোমাদের কাছে আসিয়া বসিলেন, সেই বিপদের সময়েও ইনি ভিন্ন আর কেহই কাছে থাকিবে না। ইঁহারই নাম ভবের নাবিক। ইনিই তখন বলিবেন, "কন্যা, ভয় নাই, এই লও আমার চরণতরী"। অতএব ইঁহার চরণতরী এখনই ভাল করিয়া ধর। অনায়াসে হাসিতে হাসিতে ভবসাগর পার হইয়া যাইবে। এবার তোমাদিগকে লইয়া যাইবার জন্য সঙ্কল্প করিয়া তিনি বাহির হইয়াছেন, তাঁহার চরণ ধরিয়া আনন্দ মনে তাঁহার গৃহে চলিয়া যাও।—(পৃঃ ৭০)

তোমরা স্বর্গে বসিলে তাঁহার কত আনন্দ হইবে। ঐ দেখ, তোমাদের জন্য তাঁহার ঘরে কত সুন্দর সুন্দর আসন খালি রহিয়াছে। তোমাদিগকে নিয়া তাঁহার কাছে বসাইবেন, এই জন্য তিনি বাহির হইয়াছেন।—(পৃঃ ৭২)

পরিশিষ্ট।



আচার্য্যের উপদেশ—পঞ্চম খণ্ড।

১

সুখধাম—

যাঁহাদের অন্তর হইতে পিতা আপনি ভক্তি উপহার গ্রহণ করিতেছেন, যাঁহাদের হৃদয় সর্ব্বদাই স্বর্গের পুষ্পগন্ধে আমোদিত, সেখানে দুঃখের সম্ভাবনা কোথায়? একবার যদি সেই উদ্যানে উপস্থিত হইতে পার, এই পৃথিবীর বাড়ী ঘর, আত্মীয়, কুটুম্ব, ধন, মান, সুখ, সম্পত্তি, পদ, ঐশ্বর্য্য সকলই ভুলিয়া যাইবে। ঈশ্বর তোমাদিগকে যে স্থানে যাইতে ডাকিতেছেন, ইহা সামান্য স্থান নহে। সমস্ত পৃথিবীর মধ্যে এই একটী মাত্র স্থান। এই ভূমি সমস্ত জগতের ভূমি, এই স্থানের বায়ু সমস্ত পৃথিবীর বায়ু, এই স্থানের আলোক সমস্ত পৃথিবীর আলোক। এই আলোক পাইয়া এক দিন সমস্ত জগৎ আলোকিত হইবে, এই বায়ু সেবন করিয়া পৃথিবীর সমুদয় নর নারী বাঁচিবে। যখন সমুদয় জগদ্বাসী এই ভূমিতে আরোহণ করিবে, তখনই তাবৎ জগতের পরিত্রাণ। ঈশ্বর আশীর্ব্বাদ করুন, ইহা ভিন্ন যেন আমাদের অন্য কোথাও বসিতে না হয়।—(পৃঃ ১৫০)

পিতার এই চরণভূমি সন্তানদিগের সুখধাম, ইহাই জীবের স্বর্গ এবং শান্তি-নিকেতন।—(পৃঃ ১৫১)

সঙ্গীত।

আলেয়া—একতালা।

ইহলোক পরলোক, কভু নয় পৃথক, তোমারি অভয় চরণে। তুমি বাঁধিয়ে রেখেছ দোঁহে, তোমার অচ্ছেদ্য প্রেম-বন্ধনে।

তুমি সুন্দর শ্রীহরি, উভয় লোক আলো করি, আছ সমানে; তুমি রাখিতেছ প্রেমকোলে, ইহ-পরলোকবাসিগণে।

তোমারি আহ্বানে এসে, থাকে জীব ভববাসে, তব নিদেশে; আবার যথাকালে যায় হে চলে, তোমার নিত্য নিকেতনে॥ ১॥

—০—

খাম্বাজ—একতালা।

ইহ-পরলোকে, আঁধারে আলোকে, তুমি আছ বর্ত্তমান। যে দেখে তোমাকে, যোগের আলোকে, থাকে না তার ভেদ-জ্ঞান।

বিশ্বাস-নয়নে যে জন তোমায়, করে নিরীক্ষণ আপন আত্মায়; বিরহ, বিচ্ছেদ, শোক, তাপ, খেদ, করে না তায় অবস্থান।

যে লভে তোমার সুন্দর চরণ, পুণ্য সহবাস মধুর মিলন; চিন্ময় জগতে, সকলের সাথে, হ'য়ে থাকে এক-প্রাণ (যোগ-বলে)।

ইহ-পরলোকে রাখ দয়াময়, জীবনে কেবলই হোক তোমার জয়; তব পুণ্য নামে, যেন দিব্যধামে, পরিণামে পাই হে স্থান॥ ২॥

—০—

কীর্ত্তন—খ্যামটা।

জয় জয় সচ্চিদানন্দ হরে। হোক তব ইচ্ছা পূর্ণ, সুখ দুঃখের ভিতরে।

বিচ্ছেদে মিলনে, জীবনে মরণে, তোমার ইচ্ছার জয় হেরি নয়নে; কর নিত্য নব বেশে খেলা, দাসের অন্তরে।

সম্পদে বিপদে, বিষাদে আনন্দে, রোগে শোকে চিরদিন আছি ওপদে; হাসি কাঁদি তোমার রঙ্গ দেখে, যোগানন্দ ভরে॥ ৩॥

আলেয়া—একতালা।

নাথ! তুমি সর্ব্বস্ব আমার।

প্রাণাধার সারাৎসার, নাহি তোমা বিনে, কেহ ত্রিভুবনে, আপনার বলিবার।

তুমি সুখ শান্তি সহায় সম্বল, সম্পদ ঐশ্বর্য্য জ্ঞান বুদ্ধি বল; তুমি বাসগৃহ আরামের স্থল, আত্মীয় বন্ধু পরিবার।

তুমি ইহকাল, তুমি পরিত্রাণ, তুমি পরকাল, তুমি স্বর্গধাম; তুমি শাস্ত্র বিধি, গুরু কল্পতরু, অনন্ত সুখের আধার।

তুমি হে উপায়, তুমি হে উদ্দেশ্য, তুমি স্রষ্টা পাতা, তুমি হে উপাস্য; দণ্ডদাতা পিতা, স্নেহময়ী মাতা, ভবার্ণবে কর্ণধার। (তুমি)॥ ৪॥

খাম্বাজ—ঝাঁপতাল।

জীবন মরণে তুমি নিকটে আছ শঙ্করী।

ওমা শান্তি-প্রদায়িনী দয়াময়ী ক্ষেমঙ্করী।

বসি' মোহ অন্তরালে, ইহকালে পরকালে, অমর সাধু সকলে, র'য়েছ মা কোলে করি'।

যোগেতে জীবিত হ'য়ে, সাধুবন্ধুগণে ল'য়ে, থাকিব অনন্তকাল তব পদ হৃদে ধরি; পাসরিব ভবতাপ, বিরহ শোক বিলাপ, হেরিব অমৃতধামে, প্রিয়জনে প্রাণভরি॥ ৫॥

—•—

মিশ্র জয়জয়ন্তী—একতালা।

তুমি বন্ধু, তুমি নাথ, নিশি দিন তুমি আমার।
তুমি সুখ, তুমি শান্তি, তুমি হে অমৃত-পাথার।

তুমিই তো আনন্দ লোক, জুড়াও প্রাণ নাশ শোক; তাপ-হরণ তোমার চরণ, অসীম শরণ দীন জনার॥ ৬॥

—০—

সঙ্কীর্ত্তন—খয়রা।

বল হে বিধাতা, গুরু জ্ঞানদাতা,
ব'লে দাও কাণে কাণে; (দিব্যজ্ঞানে)
কেন মৃত্যু শোকে, শেল হানে বুকে,
দেয় মর্ম্মব্যথা প্রাণে (এত) সুখের সংসারে।
তোমার শাসন, নিগূঢ় নিয়ম,
কেমনে বুঝিব হরি; (তুমি ভাঙ্গ গড় দিবা নিশি)
নিত্য নব নব, লীলা খেলা তব,
দেখে দেখে কেঁদে মরি। (বুঝিতে নারি)
কত গুণবান, মানব-সন্তান, দেখা দিয়া ধরাতলে;
(আহা রূপে গুণে মুগ্ধ করে)

তোমার ইঙ্গিতে, দেখিতে দেখিতে,
'কোথা গেল হায় চলে'। (জগৎ আঁধার করে')
এ জীবন যৌবন, বুঝিনু এখন,
সিন্ধুনীরে বিম্বপ্রায়; (এই আছে আর এই নাই হে)
কালস্রোতে ভাসি, ধীরে ধীরে আসি,
অনন্তে মিলায়ে যায়। (নয়নান্তরালে)
তুমি ধ্রুব সত্য, সংসার অনিত্য,
এই সত্য শিখাইতে; (অন্ধ জীবগণে)
জীবনের মাঝে, মরণ বিরাজে,
অলক্ষিতে পৃথিবীতে। (প্রতি ঘরে ঘরে) ॥ ৭ ॥

—•—

তেওট।

ওহে মঙ্গলময়, তোমার জগতে নাহি কিছু অমঙ্গল।
রোগ শোক নির্য্যাতন, বিপদ মরণ,
জীব উদ্ধার লাগি এ সব কৌশল।
চিরদিন নিরাপদে, ভোগ সুখ শ্রীসম্পদে,
নাহি হয় সুশিক্ষা সাধনবল; তাই সাধু-ভক্তজন,
করে আলিঙ্গন, ক্রুশ-যন্ত্রণা—পান পাত্র হলাহল।
সুখ দুঃখ মনের ভ্রান্তি, তুমি এক মাত্র শান্তি,
পরমানন্দ অনন্ত মঙ্গল;
যে জন তোমার তরে, প্রাণ দান করে,
তার মরণে জ্বলে বিশাল অনল ॥ ৮ ॥

—•—

জয়জয়ন্তী—ঝাঁপতাল।

চল সেই অমৃতধামে, চল ভাই যাই সকলে, নাহি যথা ব্যবধান ইহকাল পরকালে।

ঘুচিবে ভয় ভাবনা, না রবে ভব-যাতনা, নিরাপদে সুখে বাস করিব পিতার কোলে।

সেখানে নাহি ক্রন্দন, শোক তাপ প্রলোভন, প্রেমানন্দে ভাসে সবে শান্তি সলিলে; অনন্ত জীবনস্রোত, নিরন্তর প্রবাহিত, প্রেমের লহরী তাহে খেলে আশার হিল্লোলে।

যথায় সাধকগণে, প্রাণযোগ-সাধনে, আছেন মগন হ'য়ে জীবন-জলধি-জলে; প্রাণাধার পরমেশ্বরে, আত্ম-সমর্পণ ক'রে, অমর হ'য়েছেন তাঁরা ব্রহ্মকৃপা-বলে ॥ ৯ ॥

—০—

ঝিঁঝিট—কাওয়ালী।

অক্ষয় আনন্দধামে, চলরে পথিক মন,
পাইবে শাশ্বত সুখ, জুড়াবে দগ্ধ জীবন।
সে বড় পবিত্র দেশ, নাহি পাপ তাপ লেশ,
প্রেমানন্দে সমাবেশ, সকল শোকভঞ্জন।
(ওরে) শান্তি নামে পুণ্য-নদী, বহিতেছে নিরবধি,
রবে না মনের ব্যাধি, করিলে অবগাহন।
অজস্র অমিয় সুধা, বাঞ্ছা পূরে পাবে সদা,
ঘুচিবে আত্মার ক্ষুধা, সে সুধা করি' সেবন।
(ওরে) নিত্যানন্দ নিত্যোৎসব, অনন্ত পূর্ণ বৈভব,
অপ্রাপ্য অভাব সব, তখনি হ'বে পূরণ।

সদাব্রত তৃপ্তি অন্ন, লালসা থাকে না অন্ত,
সেবনে কামনা পূর্ণ, চিদানন্দ উদ্দীপন॥ ১০ ॥

খয়রা।

মরণের পারে, অমৃতের দ্বারে, রয়েছ মা আগুসারি।
(পথ পানে চেয়ে, দেবগণে সঙ্গে লয়ে)
অভয় বচনে, ডাকিছ সঘনে, প্রেমবাহু প্রসারি।
(কোলে নেবার তরে—ভয়ে ভীত মৃত জনে)
কালের সংহার-মুরতি ভীষণ,
ভয়ে কাঁপে হিয়া করি দরশন ;
(হুঙ্কার নাদে করে গরজন)
তার মাঝে তব মাভৈঃ রব,
দেয় প্রাণে শান্তি-বারি।
(পথশ্রান্ত-জনে—মধুর বচনে)
রোগের বেদনা, শোকের যাতনা,
তার সঙ্গে ভবপারের ভাবনা ;
(হায় কোথা যাব, কি হইবে—পথ চিনি না হে)
সেই অসময়ে, যেন মা অভয়ে,
তোমারে ডাকিতে পারি।
(মা মা বলে, প্রাণ ভরে সকাতরে)

দশকুশী।

শ্মশানে একাকী ফেলে, যবে সবে যাবে চলে,
কোলে তুলে লইবে যতনে ; (মৃত্যুর আঁধারে)

নিরখি মায়ের মুখ, ভুলিব সকল দুঃখ, চিরদিন রব তব সনে।

(লোক-লোকান্তরে—দেবলোকে শান্তিধামে)

মিশিয়া অমরদলে, মা তোমার পদতলে,

নিত্য যোগে করিব বিহার; (অনন্ত জীবনে)

জীবনের পরিণাম, সেই সুখ স্বর্গধাম,

যথা তব প্রেম-পরিবার ॥ ১১ ॥

—০—

ঝিঁঝিট—কীর্ত্তন।

ভীষণ শ্মশান-লীলা দেখে যেন ভয় না করি।

মঙ্গল নির্ব্বাণ বিধানে যেন তব মুখ হেরি। (ও মা)

আরক্ত নয়নে অসুর সংহারে, রত হও যখন পুণ্য অসি ধ'রে, বিশ্বাস-নয়নে তাহার ভিতরে, তব প্রেম-মুখ যেন হেরি।

ভয়ঙ্কর বেশে হ'য়ে অবতীর্ণ, আমিত্ব স্বামিত্ব কর যবে চূর্ণ, থাকে যেন হৃদয় এই বিশ্বাসে পূর্ণ, কাছে আছ মা ক্ষেমঙ্করী। (এই যে) ॥ ১২ ॥

—০—

খাম্বাজ বাহার—একতালা।

দু'দিনের সুখ, দু'দিনের দুখ, দু'দিনে ফুরায়ে যায়। (হায়!)

এ জীবনলীলা, এ ভবের খেলা, নিশার স্বপন প্রায়।

দেখিতে দেখিতে হয় রূপান্তর, দিব্য দেহকান্তি লাবণ্য সুন্দর, শেষে ইন্দ্রধনু নিমেষে যেমন, মিশে আকাশের গায়।

আদি অন্তে তুমি অনাদি অনন্ত, দেশ কালে তব নাহি হয় অন্ত, সৃজন-পালন-কারণ তুমি হে, জীবের জীবনোপায়; তোমার ভিতরে আমরা সকলে, রয়েছি জীবিত ইহ-পরকালে, আত্মীয় স্বজনে অমর ভবনে, নিরখিব পুনরায় ॥ ১৩ ॥

—০—

সঙ্কীর্ত্তন।

চল চল ভাই, মা'র কাছে যাই, নাচি গাই প্রেম ভরে; (গিয়ে) অমর ভবনে, দেব দেবী সনে, হেরি তাঁরে প্রাণ ভরে।

থাকিব না আর মোরা ইন্দ্রিয়-গ্রামে, যোগবলে প্রবেশিব চিদানন্দ-ধামে; (আর রব না, রব না—দেহ-পুরবাসে) সেই জন্মস্থান, হেথা অবস্থান, কেবল দু'দিনের তরে।

মহামিলন-সঙ্গীত গাইব সকলে, বসি মা আনন্দময়ীর শ্রীচরণ-তলে; (সুরে সুর মিলাইয়ে) (এক-হৃদয় হ'য়ে) অনন্ত জীবনে, অনন্ত মিলনে, বিহরিব লোকান্তরে ॥ ১৪ ॥

দোঠুকি—সঙ্কীর্ত্তন।

সম্মুখে অমরধাম, আমাদের গম্যস্থান, (ঐ দেখ চেয়ে, বিশ্বাস-নয়ন খুলি) এ সংসার পান্থ-নিবাস; (দু'দিনের তরে) সেই নববৃন্দাবনে, নিত্যলীলা-দরশনে, করিবে সম্ভোগ স্বর্গবাস। (ভক্ত-পরিবারে)

স্বর্গ-পারিজাত-গন্ধ, বহিতেছে মন্দ মন্দ, ঘ্রাণে পুলকিত হয় প্রাণ; শ্রীহরির শ্রীমন্দিরে, উড়িতেছে ধীরে ধীরে, বিশ্বজয়ী বিধান-নিশান। (প্রেম-সমীরণে)

দেব-দেবীগণ যত, (দেবদূতগণ যত) পুষ্পরথে ইতস্ততঃ, চারি-ধারে করে বিচরণ; (নব নব বেশে) শ্রান্ত পথিক জনে, মধুর আশা-বচনে, প্রেমভরে দেয় আলিঙ্গন। (আদরে হৃদয়ে ধরে, প্রেমে গলে ভাই বলে)

যথা আমাদের নেতা, ধর্ম্মপিতামহ পিতা, একে একে করিলা পয়ান; (সেথা যেতে যে হবে,—দেহ গেহ পরিহরি—ভাগবতী তনু

ধরি) মিশে সেই যাত্রিদলে, স্বদেশে যাব সকলে, করি হরিনাম-গুণ-
গান ॥ ১৫ ॥

—০—

বেহাগ—কাওয়ালী।

তোমার অসীমে প্রাণ মন লয়ে, যত দূরে আমি ধাই,
কোথাও দুঃখ, কোথাও মৃত্যু, কোথা বিচ্ছেদ নাই।
মৃত্যু সে ধরে মৃত্যুর রূপ, দুঃখ হয় সে দুঃখের কূপ,
তোমা হ'তে যবে হইয়ে বিমুখ, আপনার পানে চাই।
হে পূর্ণ তব চরণের কাছে, যাহা কিছু সব আছে আছে আছে,
নাই নাই ভয় সে শুধু আমারি, নিশি দিন কাঁদি তাই ;
অন্তর-গ্লানি সংসার-ভার, পলক ফেলিতে কোথা একাকার,
জীবনের মাঝে স্বরূপ তোমার, রাখিবারে যদি পাই ॥ ১৬ ॥

—০—

ছায়ানট—একতালা।

অল্প লইয়া থাকি, তাই মোর যাহা যায় তাহা যায়,
কণাটুকু যদি হারায়, তা ল'য়ে প্রাণ করে হায় হায়।
নদী-তট-সম কেবলি বৃথাই, প্রবাহ আঁকড়ি রাখিবারে চাই,
একে একে বুকে আঘাত করিয়া ঢেউগুলি কোথা ধায়।
যাহা যায় আর যাহা কিছু থাকে, সব যদি দিই সঁপিয়া তোমাকে,
তবে নাহি ক্ষয়, সবি জেগে রয়, তব মহা মহিমায়।
তোমাতে রয়েছে কত শশী ভানু, হারায় না কভু অণু পরমাণু,
আমারি ক্ষুদ্র হারাধনগুলি রবে না কি তব পায় ॥ ১৭ ॥

—০—

মিশ্র-ইমন্ কল্যাণ—ঝম্পক।

দুখের বেশে এসেছ বলে তোমারে নাহি ডরিব হে,
যেখানে ব্যথা, তোমায় সেথা, নিবিড় করি ধরিব হে।
আঁধারে মুখ ঢাকিলে স্বামী,
তোমারে তবু চিনিব আমি,
মরণরূপে আসিলে প্রভু, চরণ ধরি মরিব হে।
যেমন ক'রে দাও না দেখা, তোমারে নাহি ডরিব হে॥
নয়নে আজি ঝরিছে জল, ঝরুক জল নয়নে হে,
বাজিছে বুকে, বাজুক, তব কঠিন বাহু বাঁধনে হে;
তুমি যে আছ বক্ষে ধরে,
বেদনা তাহা জানাক মোরে,
চাব না কিছু কব না কথা, চাহিয়া রব বদনে হে।
নয়নে আজি ঝরিছে জল, ঝরুক জল নয়নে হে॥ ১৮॥

—•—

সিন্ধু বিজয়—তেওরা।

ঐ যে দেখা যায় আনন্দধাম, অপূর্ব্ব-শোভন,
ভবজলধির পারে জ্যোতির্ম্ময়।
শোক-তাপিত জন সবে চল,
সকল দুঃখ হবে মোচন;
শান্তি পাইবে হৃদয় মাঝে,
প্রেম জাগিবে অন্তরে।
কত যোগীন্দ্র, ঋষি মুনিগণ,
না জানি কি ধ্যানে মগন;

স্তিমিত লোচন, কি অমৃত রস,
পানে ভুলিল চরাচর।
কি সুধাময় গান, গাহিছে সুরগণ,
বিমল বিভুগুণ-বন্দনা;
কোটী চন্দ্র তারা উলসিত,
নৃত্য করিছে অবিরাম ॥ ১৯ ॥

—•—

মিশ্র বিভাস—ঝাঁপতাল।

মা শান্তিস্বরূপিণী, সঙ্কট-নিবারিণী।
শিবে সন্তান-বৎসলে, শোক-সন্তাপহারিণী,
মূর্ত্তিমতী শান্তি তুমি নির্ব্বাণদায়িনী;
শান্তি বারি ল'য়ে হাতে, ছিটাইয়া দাও মাথে,
নিজ মুখে বল শান্তি, শুনাও সান্ত্বনা-বাণী।
ত্রিতাপ-অনলে প্রাণ জ্বলে দিন যামিনী,
অন্তরের ব্যথা সব জান অন্তর-যামিনী;
কোথায় কাঁদিব আর যাইব কোথায় বল,
আদরে হৃদয়ে ধরে কে মুছাবে অশ্রুজল;
তুমি মাতঃ কেবল, আশা ভরসা সম্বল,
দীন অনাথে কৃপা কর দীনতারিণী ॥ ২০ ॥

—•—

ভৈরবী।

কি আর চাহিব বল, হে মোর প্রিয়,
তুমি যে শিব, তাহা বুঝিতে দিও।

বলিব না "রেখো সুখে", চাহ যদি রেখো দুখে,
তুমি যাহা ভাল বোঝ তাই করিও—
শুধু তুমি যে শিব, তাহা বুঝিতে দিও।
যে পথে চালাবে নিজে, চলিব, চাব না পিছে,
আমার ভাবনা, প্রিয়! তুমি ভাবিও—
শুধু তুমি যে শিব, তাহা বুঝিতে দিও।
(দেখ) সকলে আনিল মালা, ভকতি-চন্দন থালা,
আমার যে শূন্য ডালা, তুমি ভরিও!—
আর, তুমি যে শিব, তাহা বুঝিতে দিও॥ ২১॥

বাউল।

আমারে এ আঁধারে এমন করে' চালায় কে গো?
'মি দেখতে নারি, ধর্‌তে নারি, বুঝ্‌তে নারি কিছুই যে গো
নয়নে নাহি ভাতি, মনে হয় চিররাতি,
মনে হয় তুমি আমার চিরসাথী;
একবার জ্বালিয়ে বাতি, ঘুচিয়ে রাতি,
নয়নভরে দেখা দে গো!
(এই রাত-কাণারে) নয়নভরে দেখা দে গো!
কাঁদায়ে কাঁটার ক্লেশে, কঠিন এই পথের শেষে,
না জানি নিয়ে যাবে কোন বিদেশে;
একবার ভালবেসে কাছে এসে,
কাণে কাণে বলে দে গো!
(এ কালারে) কাণে কাণে বলে দে গো!

রয়েছিস্ যদি সাথে, দারুণ এ আঁধার রাতে,
ক্লান্ত মোরে চালিয়ে নে যা হাতে হাতে;
হস্ত আমার হলেও শিথিল, তুই আমারে ছাড়িস্ নে গো!
(তোর পায়ে পড়ি) তুই আমারে ছাড়িস্ নে গো ॥ ২২ ॥

মূলতান।

যখন ভেবে চিন্তে দেখি, (দেখি) আমার বল্‌তে আমার,
তোমা বিনা আর কেউ নাই।
যত মহামূল্য ধন, প্রাণপ্রিয়জন, তোমারে হারালে সব হারাই।
তৃষিত হৃদয় কাতর হইয়ে,
দাঁড়ায় কোথায় তোমারে ছাড়িয়ে,
আপনার বলে তুলে নিতে কোলে,
তোমা বিনা আর কারেও না পাই।
প্রভু, ইহলোক তুমি, পরলোক তুমি,
চির বাসস্থান, চির জন্মভূমি,
যত আত্মীয় স্বজন, হারান রতন,
একাধারে প্রভু তোমাতে পাই।
তুমি সুখ শান্তি, শোকার্ত্তের সান্ত্বনা,
তুমি চিন্তামণি, ভবের ভাবনা,
নিরাশের আশা, তুমি ভালবাসা,
তোমাতেই মোরা প্রাণ জুড়াই ॥ ২৩ ॥

রয়েছিস্ যদি সাথে, দারুণ এ আঁধার রাতে,
ক্লান্ত মোরে চালিয়ে নে যা হাতে হাতে;
হস্ত আমার হলেও শিথিল, তুই আমারে ছাড়িস্ নে গো!
(তোর পায়ে পড়ি) তুই আমারে ছাড়িস্ নে গো॥ ২২॥

মূলতান।

যখন ভেবে চিন্তে দেখি, (দেখি) আমার বল্‌তে আমার,
তোমা বিনা আর কেউ নাই।
যত মহামূল্য ধন, প্রাণপ্রিয়জন, তোমারে হারালে সব হারাই।
তৃষিত হৃদয় কাতর হইয়ে,
দাঁড়ায় কোথায় তোমারে ছাড়িয়ে,
আপনার বলে তুলে নিতে কোলে,
তোমা বিনা আর কারেও না পাই।
প্রভু, ইহলোক তুমি, পরলোক তুমি,
চির বাসস্থান, চির জন্মভুমি,
যত আত্মীয় স্বজন, হারান রতন,
একাধারে প্রভু তোমাতে পাই।
তুমি সুখ শান্তি, শোকার্ত্তের সান্ত্বনা,
তুমি চিন্তামণি, ভবের ভাবনা,
নিরাশের আশা, তুমি ভালবাসা,
তোমাতেই মোরা প্রাণ জুড়াই॥ ২৩॥